وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا - زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا
محمد ﷺ مہر گردس چار اختر - ابو بکر و عمر عثماں و حیدر رضی اللہ عنہم

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূর এবং তাঁর শরীর মুবারক ছায়াবিহীন - এ মর্মে অকাট্য প্রমাণাদি সম্বলিত

পুস্তক

রিসালাহ্-ই নূর

[رسَالَۂ نُوْر]

মূল

হাকীমুল উম্মত হযরতুলহাজ্ব মুফতী

আহমদ ইয়ার খান নঈমী বদায়ূনী

[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার,

আলমগীর খানকাহ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

প্রকাশনায়

আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,

E-mail:anjumanturst@gmail.com,monthlytarjuman@gmail.com

www.anjumantrust.org

রিসালাহ্-ই নূর

[رسَالَۂ نُوْر]

মূল

হাকীমুল উম্মত হযরতুলহাজ্ব মুফতী

আহমদ ইয়ার খান নঈমী বদায়ূনী

[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার,

আলমগীর খানকাহ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল

৬ রজব, ১৪৩৭ হিজরী

১ বৈশাখ ১৪২৩ বাংলা

১৪ এপ্রিল ২০১৬ ইংরেজী

কম্পোজ - সেটিং

মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন

সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশকের

হাদিয়াঃ ৬০/- (ষাট) টাকা

RESALAH-E NOOR, WRITTEN BY HAKIMUL UMMAH, HAZRATUL HAJJ ALLAMA MUFTI AHMAD YAR KHAN NAEEMY BADAYUNI RAHMATULLAHI TA'ALA ALAIHI, TRANSLATED INTO BANGALI BY **MOULANA MUHAMMAD ABDUL MANNAN**, DIRECTOR GENERAL, ANJUMAN RESEARCH CENTER, CHITTAGONG, PUBLISHED BY **ANJUMAN-E RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST.** CHITTAGONG, BANGLADESH. **HADIAH TK. 60**/- ONLY.

সূচীপত্র

ক্র.ম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	বঙ্গানুবাদকের কথা (মুখবন্ধ)	০৪
০২.	**ক্বসীদাহ্-ই নূরঃ** আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী আলায়হির রাহ্মাহ্	০৮
০৩.	মূল লেখক মহোদয়ের বক্তব্য	১১
০৪.	ভূমিকা	১৩
০৫.	**প্রথম অধ্যায়** **প্রথম পরিচ্ছেদঃ** পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে হুযূর-ই আক্রাম নূর	২১
০৬.	সম্মানিত মুফাস্সিরগণের বক্তব্যসমূহ	২৪
০৭.	হাদীস শরীফের আলোকে হুযূর-ই আক্রাম নূর	২৭
০৮.	ওলামা-ই ইসলামের মতে হুযূর-ই আক্রাম নূর	৩০
০৯.	এ মর্মে দেওবন্দী আলিমদের অভিমতসমূহ	৩৪
১০.	যুক্তির আলোকে হুযূর-ই আক্রাম নূর	৩৮
১১.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ** বিরুদ্ধবাদীদের ১৫টি আপত্তি ও সেগুলোর খন্ডন	৪২
১২.	**দ্বিতীয় অধ্যায়** **প্রথম পরিচ্ছেদঃ** ছায়াহীন কায়া শরীফ পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে	৬৩
১৩.	হাদীস শরীফের আলোকে হুযূর-ই আক্রাম ছায়াহীন	৬৫
১২.	মনীষীদের মতে বিশ্বনবী ছায়াহীন	৬৯
১৫.	দেওবন্দী-ওহাবীদের সমর্থন	৭১
১৬.	যুক্তির আলোকে হুযূর-ই আক্রাম ছায়াহীন	৭২
১৭.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** বিরুদ্ধবাদীদের ৩টি আপত্তি ও সেগুলোর খন্ডন	৭৪
১৮.	ইমাম গায্যালী আলায়হির রাহ্মাহর অভিমত	৭৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

নাহ্মাদুহূ ওয়ানুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু 'আলা হাবীবিহিল করীম
ওয়া 'আলা- আ-লিহী ওয়া সাহ্বিহী আজমা'ঈন

হক্ব ও বাতিলের পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্ব মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই চলে আসছে। হক্বপন্থীরা সব সময় বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করে এসেছেন ও আসছেন। এ পর্যন্ত আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর মেহেরবাণীতে প্রতিটি ক্ষেত্রে হক্ব বা সত্যের জয় হয়ে এসেছে; ক্বিয়ামত পর্যন্ত হবেও ইন্শা-আল্লাহ।

আমাদের আক্বা ও মাওলা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনের ফলে এ হক্ব ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এ মীমাংসাও ক্বিয়ামত অবধি স্থায়ী। যেসব বিষয় ইসলামের চতুর্দলীল, মুসলিম মনীষীদের অভিমত ও বাস্তবতা দ্বারা অকাট্যভাবে মীমাংসিত, ওইসব বিষয়ের মধ্যে এও রয়েছে যে, আল্লাহর হাবীব, আমাদের আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্ট; বাহ্যিকভাবে মানবীয় সূরতে দুনিয়ায় তাশরীফ আনয়ন করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়- তাঁর হাক্বীক্বত (মূল) হচ্ছে নূর; এ নূরী রসূল বাশারিয়াত বা মানবীয় আকৃতিতে দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন। সুতরাং তাঁর যাত বা সত্তা মুবারকে দু'টি দিক রয়েছে- একটি হলো নূরানিয়াত, অপরটি হচ্ছে বাশারিয়াত। হুযূর-ই আক্রামের অনেক বিষয় এমনই রয়েছে, যেগুলো দ্বারা তাঁর নূরানিয়াত প্রমাণিত হয়, আবার এমনও অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলোতে তাঁর বাশারিয়াতের তাজাল্লী বা জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। এজন্য হুযূর-ই আক্রামের 'নূরানিয়াত' যেমন অকাট্য, তেমনি হুযূর-ই আকরামের 'বাশারিয়াত' বা 'মানব হওয়া'ও অতুলনীয়। হুযূর-ই আক্রাম যেমন 'নূর নবী', 'নূরী রসূল', তেমনি 'নূরী বশর'।

উল্লেখ্য, আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে তাঁর কোন নূরী বান্দার মধ্যে যদি মানবিকতার সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়, তখন তাও যে সম্ভব এবং এর বাস্তবতাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। পবিত্র ক্বোরআনেও বিভিন্ন স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহর নূরী ফিরিশ্তা একাধিকবার মানবীয় আকৃতিতে দুনিয়ায় এসেছেন; বহু সহীহ্ হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাকুল সরদার হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম মানবরূপে হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র দরবারে এসেছেন।

সুতরাং নূরী রসূল আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামও যে বাহ্যিকভাবে মানবীয় আকৃতিতে তাশরীফ আনয়ন করা সম্ভব, তাতে সন্দেহ নেই। এ কারণে, এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি অন্যতম মৌলিক আক্বীদা। তাই সুন্নী মুসলমানগণ আমাদের নবী করীমকে 'নূর নবী' 'নূরের নবী' ইত্যাদি উপাধিতে স্মরণ করেন। সাথে সাথে নূর নবীর নূরী বাশারিয়াতের প্রতিও বিশ্বাস রাখেন। পক্ষান্তরে, বাতিল আক্বীদা পোষণকারী অসুন্নী সম্প্রদায় নবী করীমের নূরানিয়াতের বিষয়টা স্বীকার করতে চায় না; বরং নূর নবীকে মাটির মানুষ, নিছক বশর ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করে এবং পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস শরীফ থেকে ব্যাখ্যাযোগ্য আয়াত ও হাদীস ইত্যাদিকে নিজেদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করার অপচেষ্টা চালায়।

অতি সুখের বিষয় যে, 'আহলে সুন্নাত' নবী করীমের নূরানিয়াতকে প্রমাণ করার এবং বাতিলপন্থীদের ভিন্ন মতবাদ ও তাদের খোঁড়াযুক্তি ও প্রমাণগুলোর খন্ডন করে এসেছেন। আহলে সুন্নাত দেশে বিদেশে নবী-ই আক্রামের শানে ম্যাগাজিন ও কিতাব লিখেন- 'মাওলেদুন্নুর' ও 'নূর নবী' ইত্যাদি শিরোনামে, পক্ষান্তরে বাতিলরা বই লিখে 'মানুষ মুহাম্মদ' ও 'মাটির মানুষ' ইত্যাদি শিরোনামে (না'ঊযুবিল্লাহ্)।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অতি সাম্প্রতিককালে আমাদের সুন্নী অঙ্গনের কিছু উল্লেখযোগ্য ও অউল্লেখযোগ্য লোক নবী করীমের নূরানিয়াতকে স্বীকার করলেও সেটাকে গৌণ করে দেখাচ্ছেন অথবা সীমাতিক্রম করছেন। অর্থাৎ বাহ্যিক আকৃতিতে নবী করীম 'মানব জাতি'র অন্তর্ভূক্ত (জিনসে বশর) হলেও সেটাকে নতুন করে প্রমাণ করার জন্য নিজের জ্ঞান, সনদ ও খ্যাতিকে কাজে লাগাচ্ছেন। আর কেউ কেউ অতি মুহাব্বত দেখাতে গিয়ে নবী পাক সম্পর্কে এমন এমন আক্বীদা পোষণ ও প্রচার করছে, যেগুলো শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এগুলোকে সরে যমীন তদন্ত করে ও সম্প্রতি প্রকাশিত বই-পুস্তক পাঠ-পর্যালোচনা এবং সরাসরি আলাপ-আলোচনা করে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে-

১. এক শ্রেণীর লোক বলছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'মাখলূক্ব' (আল্লাহর সৃষ্ট) বললে নাকি কাফির হয়ে যাবে! (না'ঊযুবিল্লাহ্)

২. দ্বিতীয় দল বলছে- নবী করীম নূর, তবে তাঁর নূর নাকি 'নূরে ক্বাদীম' (আল্লাহর মতো অবিনশ্বর)। (না'ঊযুবিল্লাহ্)

৩. তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা বলছে- আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব শক্তিমান। তিনি 'কুন' (হয়ে যা) বলার ইচ্ছা করলে তা হয়ে যায়। সুতরাং নবী করীমকেও আল্লাহ্ তা'আলা 'কুন' বলে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁকে 'নূর দিয়ে' নাকি 'মাটি দিয়ে' সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি বলার নাকি অবকাশ নেই!

৪. চতুর্থ শ্রেণীর লোকদের কথা হচ্ছে- নবী করীম হাক্বীক্বতে নূর হলেও 'জিন্স' বা জাতিতে বশর। তারা বলে, নবী করীমের 'বাশারিয়াত'কে অস্বীকার করলে কাফির হবে; কিন্তু 'নূরানিয়াত'কে অস্বীকার করলে সে কাফির হবে না। তাই হুযূর-ই আক্রাম 'জিনসে বশর'-একথার উপরই বেশি জোর দিতে হবে। হুযূর-ই আক্রামের নূরানিয়াতটা যেন তাদের কাছে একেবারে গৌণ। তাদের এ বক্তব্যে আহলে সুন্নাত হলেন মর্মাহত, আর বাতিলরা হলো আনন্দিত (!)

অবশ্য, এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে, হুযূর-ই আক্রামের 'নূরানিয়াত' (নূর থেকে সৃষ্ট হওয়া) শুরু থেকে এতই সুস্পষ্ট, অকাট্য ও সর্বজন গ্রাহ্য যে, ফক্বীহ্ বা মুফতীগণের সামনে এ বিষয়টা প্রশ্নাকারে আসার প্রয়োজন ও অনুভূত হয়নি; কিন্তু হুযূর-ই আক্রামের নূরানিয়াতের অবস্থা দেখে কেউ আবার হুযূর-ই আক্রামের বাশারিয়াতকে অস্বীকার করে বসে কিনা- তাই ইসলামী বিশ্বের বরেণ্য ফক্বীহ্ ও মুফতীগণ সাথে সাথে এ মাসআলাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হুযূর-ই আক্রামের বাহ্যিক দিক ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- বাশারিয়াত। তাঁদের দলীল হচ্ছে ক্বোরআনে পাক। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীবকে বলেছেন, ''আপনি বলে দিন, 'আমি (বাহ্যিকভাবে) বশর, অন্যথায় অন্যান্য নবীগণের তুলনায় আপনার মু'জিযাদি অগণিত। কোন কোন নবীর কয়েকটা মাত্র মু'জিযা দেখে তাঁদের উম্মতগণ তাঁদেরকে 'খোদা' 'খোদার পুত্র', 'তাঁদের মধ্যে খোদার অনুপ্রবেশ ঘটেছে' ইত্যাদি বলে শির্কী আক্বীদা পোষণ করে বসেছে। সুতরাং আপনি নিজেকে বাহ্যিকভাবে বশর ঘোষণা দিয়ে মানুষকে 'শির্ক' থেকে

রক্ষা করুন! সুবহা-নাল্লাহ্! তাই ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরতসহ বরেণ্য ফিক্বহ্বিদদের কিতাবাদিতেও হুযূর-ই আক্রামের বাশারিয়াতের বৈশিষ্ট্যটাকে অস্বীকার করলে কুফরী হবে বলে সুস্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায়। আর হুযূর-ই আক্রামের নূরানিয়াতের বিষয়টা তো পবিত্র ক্বোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও ক্বিয়াস ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণিত আছেই। তাই হুযূর-ই আক্রামের নূরানিয়াতকে অস্বীকার করার যেমন উপায় নেই, তেমনি সেটাকে কোন ফক্বীহর সুস্পষ্ট অভিমত উপস্থাপনের দাবী উত্তোলন কিংবা অন্য কোন অজুহাতে গৌণ করে দেখানোরও সুযোগ নেই। অবশ্য, কোন বিজ্ঞ ও আলিম যদি আহলে সুন্নাতের সর্বজন স্বীকৃত আক্বীদার উপর স্থির রয়ে কাউকে হুযূর-ই আক্রামের বশরিয়াতকে অস্বীকার করতে দেখে কিংবা হুযূর-ই আন্ওয়ারের নূরানিয়াতকে নিয়ে শির্কী কিংবা পথভ্রষ্টতাসূলভ আক্বীদা সৃষ্টি করতে দেখে হুযূর-ই আক্রামের 'বশরিয়াত'-এর বিষয়টাকে মুসলমানদের সামনে সুস্পষ্ট করতে চান, তাহলে তিনি তো একটা ফিৎনার নিরসন করার মতো দ্বীনী দায়িত্বই পালন করেছেন। সেজন্য তিনি সাধুবাদ ও ধন্যবাদ পাবার উপযোগী।

বলাবাহুল্য, এ উপরিউক্ত চারটি দলের বাড়াবাড়িতে সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন অঞ্চলে তুমুল দ্বন্দ্ব চলছে। লেখালেখী, সভা-সমিতি, পাল্টা সভা, মাহফিল, পাল্টা মাহফিল ব্যক্তি ও সংগঠনগত দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ ও কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি চলছে অহরহ। অথচ হুযূর-ই আক্রামের নূরানিয়াত ও বশরিয়াত এবং 'নূর ও বশর' গুণ দু'টির একই সত্তায় সমন্বিত হওয়া সম্ভব। বিষয়গুলো নিয়ে বাদানুবাদ অনেকদিন আগে থেকে চলে আসছে। তাই, আমাদের আস্লাফ (অগ্রণী বুযুর্গগণ) এ মাসআলাকে অতি সহজ করে এভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের আক্বা ও মাওলা আল্লাহর নূরের তৈরী, তিনি তখনো নবী ছিলেন, যখন আবুল বশর হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর অস্তিত্বও সৃষ্টি হয়নি। পরবর্তীতে হযরত আদম আলায়হিস্ সালামও নবী করীমের নূর থেকে সৃষ্টি হবার পর এ নূরী নবী শেষ যমানায় তাঁরই সন্তান হিসেবে দুনিয়াতে তাশরীফ আনলে তিনি বশর বা মানবের 'জিন্স' বা জাতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে মানবকুলকে ধন্য ও সম্মানিত করেছেন। অন্যভাষায়, নূরী নবীর মধ্যে 'বাশারিয়াত'-এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে। তাছাড়া, এ নূরী নবীর পবিত্র সত্তায় আল্লাহ্ তা'আলা বশরিয়াতের সমন্বয় এমনভাবে ঘটিয়েছেন যে, তা মানব-বিবেককেও হতবাক করে দেয়।

নবী করীমের পার্থিব জীবদ্দশায় এমনসব ঘটনাও ঘটেছে, যেগুলোকে তাঁর নূরানিয়াত না বলার উপায় নেই, আর এমন সব ঘটানাও ঘটেছে, যেগুলোকে তাঁর মানবীয় বৈশিষ্ট্যেরই ঝলক বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই, আহলে সুন্নাতের দৃষ্টি হুযূর-ই আক্রামের হাক্বীক্বতের দিকে। তাই তাঁদের নিকট আমাদের নবী 'নূর নবী', পক্ষান্তরে তাঁর নূরানিয়াতকে গৌণ করে দেখে কিংবা অস্বীকার করে এমন বাতিলরা নবী করীমকে নিছক মানুষ ছাড়া অন্য কিছু বলতে নারায। অথচ, এটা একটা স্পর্শকাতর বিষয়। তাই মুহাক্কিক্ব আলাল ইত্বলাক্ব হযরত আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির রাহ্মাহ্ 'ক্বুল ইন্নামা--- আনা বশারুম মিসলুকুম' [হে হাবীব! আপনি বলে দিন, আমি (বাহ্যিকভাবে) তোমাদের মতো মানুষ।] আয়াতটাকে 'মুতাশাবিহাত' পর্যায়ের আয়াতগুলোর মধ্যে গণনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ্! অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ভাল জানেন তাঁর হাবীবের পবিত্র সত্তা সম্পর্কে।

বলাবাহুল্য, মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে সৃষ্ট এ বিতর্কের নিরসন একান্ত জরুরী। তাই আমি অধম এ বিষয়ের উপর একটা প্রামাণ্য ও উপরোক্ত বিতর্কাদির নিরসনকারী একটি পুস্তক

রচনার সিদ্ধান্ত নিলাম। সুতরাং এ প্রসঙ্গে পাঠ-পর্যালোচনা ও গবেষণার পরম্পরায় হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান ন'ঈমী বদায়ূনী আলায়হির রাহমাহর 'রিসালাহ-ই নূর'কেই (উর্দু ভাষায় লিখিত) আমি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট হিসেবে দেখতে পাই। এ কিতাবে মূল লেখক মহোদয় আলায়হির রাহমাহ্ আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে ক্বোরআন, হাদীস, ইজমা' ও ক্বিয়াস এবং মুসলিম মনীষীদের অভিমত অতি প্রামাণ্যভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন এবং তৎসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের অনেক আপত্তির জবাবও দিয়েছেন।

তদুপরি, হুযূর-ই আক্রাম নূর হওয়ার অন্যতম প্রমাণ- তাঁর ছায়া না থাকার পক্ষেও যথেষ্ট পরিমাণে দলীল-প্রমাণ রয়েছে এ কিতাবে। আরো মজার বিষয় যে, তাঁর এ পুস্তিকায় আমি সাম্প্রতিক কালের যেসব নতুন নতুন ফিৎনাধর্মী বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছি সেগুলোর জবাবও এসে গেছে। বিশেষত, এ বিষয়ও যে, হুযূর-ই আক্রামকে আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিকভাবে মানবরূপেই পাঠিয়েছেন, জিন্ কিংবা ফেরেশতারূপে পাঠাননি। 'মানব জাতি' সৃষ্টির সেরা হবার এটাও অন্যতম প্রধান কারণ; অন্যথায় জিন কিংবা ফেরেশতা সৃষ্টির সেরা হয়ে যেতো। হুযূর-ই আক্রাম 'জিনসে বশর' (মানব জাতির অন্তর্ভূক্ত)-এর অর্থ শুধু এটাই। এতদ্ব্যতীত, হুযূরের নূরানিয়াতের বিষয়টাকে উপেক্ষা করে এটাকে মূখ্য করে দেখালে সমূহ বিপদ অনিবার্য। তদুপরি, হুযূর-ই আক্রামের 'বাশারিয়াত' যেমন অকাট্য, তেমনি হুযুর আন্ওয়ারের নূরানিয়াতও অকাট্য; বরং তা-ই হাক্বীকৃত বা বাস্তব। এসব কারণে আমি হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান আলায়হির রাহ্মাহর 'রিসালাহ্-ই নূর' কিতাবটার সরল বাংলায় অনুবাদ করে একই নামে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সুখের বিষয় যে, কিতাবটার প্রকাশনার দায়িত্ব নিলেন 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'-এর প্রকাশনা বিভাগ। সুতরাং এ ফিৎনার যুগে, আশাকরি, কিতাবটা এক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করবে। পরিশেষে, উর্দু ভাষীদের ন্যায় বাংলাভাষীদের নিকটও কিতাবটা সমাদৃত হলে আমাদের সকলের এ প্রয়াস সার্থক হবে- এতে সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করুন। আমী-ন। নূরী নবীর নূরের ঝলক আমাদের যাহির ও বাতিনকে আলোকিত করে দিক। সুম্মা-আ-মী-ন।

ইতি-

(মাওলানা মুহাম্মদ আবিদুল মান্নান)
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

ہ قصید نور

ارا عاحہ مریـفاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضواں

صبح طیبہ میں ہوئی بٹاہے بارا نورکا	۱	صدقہ لینے نورکا آیا ہے ارا نور کا
طیبہ میں ا پھول پھولا نورکا	۲	مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نورکا
بارھویں کہ چاندکا مجراہے سجدہ نورکا	۳	بارہ برجوں سے جھکا اک اک ستارانورکا
اں کے قصر خلد سے ایک کمرہ نورکا	۴	سدرہ پائیں میں ننھا سا پودنورکا
آئی بدعیت چھائی ظلمت رنگ بدلا نورکا	۵	ماہ بیت مہر طلعت لے لے بدلا نورکا
توہے سایہ نورکا ہر عضو ٹکڑا نورا کا	۶	سایہ کا سایہ نہ یا ہے نہ سایہ نورکا
تیرے ہی ماتھے رہائے جاں سہرانورکا	۷	بخت جاگا نور کا چمکا ستارا نور کا
میں گداتو پادساہ بھردے پیالہ نور کا	۸	نور دں ا تیرا دال صدقہ نورکا
اج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا	۹	سر جھکا ہیں لہی بول بالا نور کا
تیرے آگے خاک پر جھکتاہے ماتھانور کا	۱۰	نورنے پایا تیرے سجدے سے سیمانورکا
پڑتی نوری بھرں امڈاہے دریانور کا	۱۱	سر جھکا ائے کشت کفر آیاہے اہلانورکا
اریوں کادور تھادل جل رہاتھانور کا	۱۲	تم کو دیکھا ہوگیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا	۱۳	توہے عین نور تیرا سب گھرانورکا

۱۴ - ائے رضایہ احمد نوری کافیض نوری ہے
ہوگئی تیری غزل برھ کر قصیدہ نورکا

কসীদাহ্-ই নূর

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা

আলায়হির্ রাহ্মাহ্

অর্থ:

১. মদীনা তাইয়্যেবায় প্রতিদিন ভোরে নূরী সরকার-ই দু'জাহান-এর দরবার থেকে নূরানী খায়রাত (দান-দক্ষিণা) বন্টন করা হয়।
নূরানী তারকাও নূরের খায়রাত নিয়ে নিজের নূরানিয়াতকে বৃদ্ধি করার জন্য রসূলে করীমের পবিত্র দরবারে হাযির হয়।

২. মদীনা তাইয়্যেবার বাগানে একটি নূরানী সুন্দর ফুল ফুটেছে, বুলবুলিরা সেটার খুশবুতে আত্মহারা হয়ে নূরানী তারানা গাইতে থাকে।

৩. (এ পংক্তিতে আ'লা হযরত 'ইল্মে নুজূম'-এর পরিভাষায় নবী-ই করীমের প্রশংসা করেছেন। অর্থাৎ) চাঁদ তার দ্বাদশ তারিখে নবী করীমের পবিত্র বেলাদতের প্রতি আদব প্রদর্শন করে নূরানী সাজদাহ্ পেশ করেছে। শুধু একটা চাঁদ নয়; বরং বারটি কক্ষপথ থেকে প্রতিটি তারকা ঝুঁকে সালাম পেশ করেছে।

৪. জান্নাত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জান্নাতী মহলের একটা মাত্র নূরী কামরার সমান। আর কুল গাছ (সিদরাহ্) হুযূর-ই আক্রামের বাগানের পাদ দেশের বৃক্ষগুলো থেকে একটা ছোট্ট নূরানী চারার মতোই।
একজন সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতী জান্নাতে গোটা দুনিয়ার সমান জমি পাবেন। সুতরাং আপনি আন্দাজ করুন, জান্নাত কত বড় হবে! আর জান্নাতগুলোর পরিমাণ হুযূর-ই আক্রামের একটি মাত্র কামরার সমান হবে।
এ থেকে সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্বের বিষয়টি অনুমান করা যায়। বিশাল ও প্রশস্ত বাড়ী থেকে বাড়ীর মালিকের ও তাতে অবস্থানকারীর মর্যাদা বুঝা যায়। তাঁর ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দুরূদ।

৫. পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে বিভিন্ন মন্দ বিষয় সৃষ্টি হয়ে গেছে। কুফরের অন্ধকার বেড়ে গেছে। নূরের নূরানিয়াত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওহে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের সুন্নাত ও ত্বরীক্বার উজ্জ্বল চন্দ্র ও সত্যের উদীয়মান সূর্য! এ পর্যন্ত নূরের স্থানে আগত কুফরের প্রতিশোধ নিয়ে নিন! (অর্থাৎ নূরের নূরানিয়াত দ্বিগুণ করে দিন, কুফরকে নিশ্চিহ্ন করে দিন! যেভাবে কা'বাকে বোত-প্রতিমাগুলো থেকে পবিত্র করে দিয়েছেন!)

৬. আপনার নূর হচ্ছে আল্লাহর ক্বুদরতের ছায়া। আপনার শরীর মুবারকের প্রতিটি অঙ্গ নূরানী। আপনি হলেন নূরী ছায়া। ছায়ার ছায়া থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ছায়া এ জন্য রাখেননি যেন কোন দুশ্মন কাফির তাঁর মাহবূবের ছায়ারও মানহানি করতে না পারে; যেন সে তাঁর ছায়ার উপর তাঁর প্রতি অশালীনতা প্রদর্শনের কুমৎলবে পা রাখতে না পারে।

৭. হে বিশ্বের প্রাণ! সাফল্যের মুকুট আপনার কপাল শরীফে বেঁধে দিয়েছেন। আপনার মাধ্যমে নূরের ভাগ্য জাগ্রত হয়েছে এবং নূরের তারকা উজ্জ্বল হয়ে গেছে।

৮. আমি ভিখারী, আর আপনি হলেন বাদশাহ্' সুতরাং হে বাদশাহগণের বাদশাহ্! আমি ভিখারীকে একটা পেয়ালা নূর দ্বারা ভর্তি করে দান করুন! আপনার নূর দিনে দ্বিগুণ, রাতে চারগুণ হোক! নূরের খায়রাত দিয়ে দিন!

৯. আপনার নূরানী আমামা (পাগড়ি শরীফ) দেখে বাদশাহ্গণ আদব সহকারে শির ঝুঁকিয়ে ফরিয়াদ করেন- হে খোদা! এ আপাদমস্তক শরীফ নূরের খ্যাতি আরো উন্নীত হোক!

১০. নূর আপনার সামনে যমীনের উপর সাজদাহ্ করার জন্য কপাল ঝুঁকায়। আপনাকে সাজদাহ্ করার কারণে নূর চাঁদনীর (পূর্ণিমার চাঁদ)-এর মত নূরানিয়াত অর্জন করেছে।

১১. নূরের মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। নূরের ঢেউ খেলে সমুদ্র সগৌরবে ছুটে চলেছে।
হে কুফরের ক্ষেত! তুমি তোমার শির অবনত করে নাও! নূরের সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন সত্তা তাশরীফ আনছেন।

১২. জাহান্নামীদের শাসন-ক্ষমতা ও দাপট চলছিলো। এটা দেখে নূরের হৃদয় ক্রোধান্বিত হয়ে জ্বলছিলো। নূর যখন আপনাকে দেখেছে, তখন তার কলিজা শীতল হয়ে গেছে। কারণ, এখন কুফরের যমানা খতম হবে এবং ইসলামী আমল আরম্ভ হবে।

১৩. হে আমাদের মুনিব! আপনার পবিত্র বংশের প্রতিটি সন্তানই নূরানী। আপনি হলেন খাঁটি নূর, আপনার সম্পূর্ণ খান্দানও নূরানী।

১৪. আ'লা হযরত বলছেন, হে রেযা! এটা হচ্ছে- আমার পীরে ত্বরীক্বতের মহান বংশধর নূরী মিঞা ক্বেবলার নূরানী ফয়য। কারণ, আমার এ গযল একটা নূরী ক্বসীদায় পরিণত হয়েছে।

....হাদা-ইক্বে বখশিশ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মূল লেখক মহোদয় হাকীমুল উম্মত হযরতুলহাজ্ব

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী বদায়ূনী

রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র

বক্তব্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْخَلَائِقِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَّ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّيْنِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতের মহান প্রতিপালক। পরকালের কল্যাণ খোদাভীরুদের জন্য অবধারিত। পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক ওই মহান সত্তার উপর, যিনি (তখনো) নবী ছিলেন, যখন হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) পানি ও যমীনের পবিত্র উপাদানের মধ্যখানে ছিলেন, আর তাঁর পবিত্র সাহাবীদের উপরও- ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

জেনে রাখা দরকার যে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে লাখো বিশেষ গুণ দান করেছেন, তেমনি হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে এ বৈশিষ্ট্যও দান করেছেন যে, তাঁকে আপন নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর সমস্ত বিশ্বকে তাঁর (নূর) থেকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তাঁর শির মুবারকের উপর 'সর্বপ্রথম হওয়া'র তাজ রেখেছেন এবং তাঁর কপাল শরীফের উপর 'সর্বশেষ হওয়া'র মুকুট পরিয়েছেন আর তাঁকেই শেষ নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকেই মি'রাজের রাতে পূর্ববর্তী সমস্ত পয়গাম্বর আলায়হিমুস্ সালাম-এর ইমাম বানিয়েছেন। আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন-

بنمار اسری میں تھا یہ ہی سر عیاں معنی اوّل و آخر
کہ دیں بستہ ہوں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے

অর্থ: 'ইস্রা' বা মি'রাজ রাতের নামাযে এ রহস্য ছিলো যে, এটা থেকে 'সর্বপ্রথম' ও 'সর্বশেষ' হওয়ার অর্থ প্রকাশ পায়। তা হচ্ছে এ যে, যাঁরা ইতোপূর্বে বাদশাহী করে গিয়েছিলেন, তাঁরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে হাত বেঁধে দন্ডায়মান থেকেছেন। (অর্থাৎ তিনি সবার শেষে প্রেরিত হলেও, এ নামাযে তিনি সবার আগে ইমাম হয়েছেন।)

বীজ গাছের পূর্বে হয়ে থাকে। তার এ বীজের উপর ভিত্তি করে ওই গাছের পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়, আর সেটা চূড়ান্ত হয়। এটা হচ্ছে ওই আক্বীদা, যার উপর আজ পর্যন্ত সমস্ত কলেমা গো ও ইসলাম তথা মুসলমান হওয়ার দাবীদার একমত। খোদ্ দেওবন্দী আলিমগণেরও এ-ই আক্বীদা রয়েছে। যেমনটি তাদের কিতাবাদি থেকে প্রকাশ পায়; কিন্তু বর্তমান যুগের নতুন নতুন দেওবন্দী-ওহাবী যেখানে হুযূর-ই আক্রামের এমন সব বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণের অস্বীকারকারী হয়ে গেছে, যেগুলোর উপর মুসলমানগণ গর্ব করে থাকেন। ওখানে তারা হুযূর-ই আক্রাম নূর হওয়ার বিষয়টাকেও অস্বীকার করে বসেছে। এখনতো এমন অবস্থা হয়েছে যে, 'হুযূর নূর হওয়া'র বিষয়টাকে অস্বীকার করার জন্য সভা ও জলসা পর্যন্ত হচ্ছে, আম দেওবন্দীরা আলিমদের পোষাকে

রাতদিন ধোঁয়া বিশিষ্ট ওয়াজ-বক্তৃতা দিচ্ছে এবং পথভ্রষ্টকারী পন্থাগুলোতে হুযূর-ই আক্রামের 'নূর হওয়া'র বিষয়টাকে অস্বীকার করছে। কথা বলার ভঙ্গিও এমন অসভ্য ও বেয়াদবীপূর্ণ যে, সেগুলো শুনে মনে হয় না কোন শিখ, খ্রিস্টান ও আর্য (হিন্দু) বলছে, নাকি কোন মুসলমান, কলেমাগো মুসলমান বলে দাবীদার এমনটি বলছে!

আমি কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিমক খেয়েছি, তাঁর নামে লালিত-পালিত হয়েছি। তাঁর দরজাগুলোতে হোঁচট খেতে খেতে জীবন-যাপন করছি, তাঁর গোলামী করার কারণে সম্মান পেয়েছি। নিমক হালাল (বিশ্বস্ত) চাকর আপন মুনিবের অবমাননা কিংবা তাঁর গুণাবলীর অস্বীকার সহ্য করতে পারে না। আমি তা দেখে দুঃখিত হয়েছি; মনে খুব কষ্ট পেয়েছি। আমার হাতে তো শুধু কলমের ধারাল নিবটুকু আছে। এটাতো সম্ভব হচ্ছে না যে, যদি বদর ও হুনায়নের ময়দান হতো এবং সেগুলোতে যেতে পারতাম, তবে নিজের প্রাণটুকু উৎসর্গ করে কাফিরদের তীর-বল্লম-তলোয়ারের আঘাত নিজের উপর নিয়ে নিতাম!

কবি বলেন-

جو ہم بھی واں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اڑیں
مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے

অর্থ: যদি আমরাও সেখানে থাকতাম, তবে ওই বাগানের মাটি শরীরে মেখে পদব্রজে সেখানে নেমে যেতাম। কিন্তু কী করবো? ভাগ্যে তো এ সৌভাগ্য অর্জিত না হওয়াই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে!

অবশ্য যদিও তা ভাগ্যে জুটেনি; তবে অন্ততপক্ষে কলমের তীক্ষ্ণধার দিয়ে ওইসব অশালীন কথা যারা বলছে, তাদের মোকাবেলা তো করতে পারি; এবং শত্রুদের সমালোচনার বাণ ওইদিক থেকে নিজের দিকে ফিরিয়ে সেটার আঘাত নিজে তো সহ্য করতে পারি। হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করবেন। আর বদর ও হুনায়নের যোদ্ধাদের গোলামীতে হাশর নসীব করবেন এবং হযরত হাস্সান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পাদুকা বহনকারীদের মধ্যে ক্বিয়ামতে উঠাতে পারেন।

একথা সামনে রেখে আমি (অধম) এ পুস্তিকা লিখার সাহস করেছি, যাতে আমি একথা প্রমাণ করেছি যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর এবং সমগ্র বিশ্বের প্রকাশ হুযূর-ই আক্রামের 'নূর' থেকে। এ পুস্তিকার নাম 'রিসালাহ্-ই নূর' রেখেছি। আর এটার বিন্যাসের ওই পদ্ধতি হবে, যা 'জা-আল হক্ব' ও 'সালতানাত-ই মোস্তফা' ইত্যাদি কিতাবের রয়েছে। এ রিসালাহকে দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রথম পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের প্রমাণ ক্বোরআনের আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহ, বুযুর্গানে দ্বীনের অভিমত এবং খোদ্ দেওবন্দী নেতাদের অভিমত থেকে দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলার উপর এ পর্যন্ত যে পরিমাণ আপত্তি হয়েছে এবং আমার জ্ঞাতসারে এসেছে, সেগুলোর খন্ডন করা হয়েছে।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ التَّوَكُّلُ وَاِلَيْهِ الْمَآبُ

এ সৎকাজটুকু করার আমার কোন সামর্থ্য নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত, আমি তাঁরই উপর ভরসা করছি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

(আহমদ ইয়ার খান ন'ঈমী বদায়ূনী)

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ كَانَ نَبِيًّا
وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

পুস্তকটায় আলোচ্য বিষয় বর্ণনার পূর্বে এ কয়েকটা মূলনীতি মনে রাখা চাইঃ

এক. 'নূর' (نور) -এর আভিধানিক অর্থ। 'নূর' (نور) শব্দের আভিধানিক অর্থ আলো, চমক-ঝলক ও উজালা। কিন্তু কখনো কখনো ওই বস্তুকেও 'নূর' বলে ফেলা হয়, যা থেকে রুশ্‌নী ও উজালা প্রকাশ পায়। এ অর্থে সূর্যকেও 'নূর' বলা হয়, বিজলী, চেরাগ ও লালটিনকেও 'নূর' অথবা 'রুশ্‌নী' বলে ফেলা হয়। অর্থাৎ 'মুসাব্বাব' (مسبّب) বলে 'সবব' (سبب) বুঝানো হয়। (অন্য ভাষায়, 'পাত্র' বলে পাত্রস্থিত জিনিষ বুঝানো হয়।)

দুই. 'নূর' (نور) দু.প্রকারের হয়ঃ ১. 'নূর-ই হিস্‌সী' (ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নূর) এবং ২. 'নূর-ই 'আক্বলী' (বিবেকগ্রাহ্য বা বিবেক দ্বারা অনুধাবনযোগ্য নূর)।

'নূর-ই হিস্‌সী' (نورحسّى) বলা হয় ওই নূরকে, যা চোখে দেখা যায়। যেমন- রোদ, চেরাগ (প্রদীপ)ও বিজলী (বিদ্যুৎ) ইত্যাদির আলো। আর 'নূর-ই আক্বলী' (نورعقلى) বলা হয় ওই নূরকে, যাকে চোখ তো অনুধাবন করতে পারেনা, কিন্তু বিবেক বলে যে, এটা নূর, এটা রুশ্‌নী। এ অর্থে 'ইসলাম'কে, 'ক্বোরআন'কে, 'হিদায়ত'কে এবং 'ইল্‌ম'কে 'নূর' বলা হয়। কতিপয় আয়াত দেখুন-

প্রথমত,

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ

তরজমা: আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যকারী মু'মিনদের, তাদেরকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোর দিকে বের করে নেন। [২: ২৫৭]

এ আয়াত শরীফে 'পথভ্রষ্টতা'কে অন্ধকার এবং 'হিদায়ত'কে নূর বা রুশ্‌নী বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত,

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

তরজমা: আমি তোমাদের দিকে সুস্পষ্ট আলো (রুশ্‌নী) নাযিল করেছি। [৪:১৭৪]

এ আয়াত শরীফে ক্বোরআনকে 'নূর' বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত,

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

তরজমা : মহান রবের নূরের উপমা ওই থাকের মতো, যাতে চেরাগ রয়েছে। [২৪:৩৫]

এ আয়াত শরীফে মহান রব আপন যাত (সত্তা)কে অথবা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নূর বলেছেন।

চতুর্থত,

وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمَاتِ ... الاية

তরজমা: এবং যে ব্যক্তি মৃত ছিলো, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য এমন নূর তৈরী করেছি, যা দ্বারা সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সেকি ওই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে, যে অন্ধকাররাজিতে রয়েছে?... [৬:১২৩]

পঞ্চমত,

اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

তরজমা: তবে কি ওই ব্যক্তি, যার বক্ষকে আল্লাহ্ ইসলামের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে আলোর উপর রয়েছে, তারই মতো হয়ে যাবে, যে পাষাণ হৃদয়? [৩৯:২২]

ষষ্ঠত,

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا

তরজমা: হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। [৬৬: ৮]

সপ্তমত,

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰاةَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْر

তরজমা: নিশ্চয় আমি তাওরীত নাযিল করেছি, তাতে রয়েছে হিদায়ত ও নূর। [৫:৪৪]

তাছাড়া, ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন-

فَاِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِّنْ اِلٰهٍ وَاِنَّ النُّوْرَ لَا يُعْطٰى لِعَاصٍ

অর্থাৎ: নিশ্চয় 'ইল্‌ম' (জ্ঞান) হচ্ছে মহান রবের নূর। আর 'নূর' গুনাহ্‌গারকে দেওয়া হয় না।

তিন. তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে 'নূর'-এর সংজ্ঞা। 'নূর' হচ্ছে- যা নিজেও প্রকাশ্য, অন্যকেও প্রকাশ করে। অর্থাৎ ظَاهِرٌ بِالذَّاتِ (নিজেও প্রকাশ্য) مُظْهِرٌ لِلْغَيْرِ (অন্যকে প্রকাশকারী)। এ প্রকাশ্য হওয়া এবং প্রকাশ করাও দু'ধরনের حِسِّىْ

ও عَقلى (যথাক্রমে, ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য ও বিবেক দ্বারা অনুধাবনযোগ্য)। চাঁদ, সূর্য, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইত্যাদি (حسّى) (ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য)ভাবে প্রকাশ্য ও প্রকাশকারী। আর ইল্‌ম (জ্ঞান), হিদায়ত, ইসলাম ও ক্বোরআন ইত্যাদি (عقلى) (বিকেকগ্রাহ্য)ভাবে নিজেও প্রকাশ্য এবং অন্যকেও প্রকাশ করে।

চার. আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃতপক্ষে (حقيقة) আযালী, আবাদী ও যাতী (যথাক্রমে অনাদি, অনন্ত ও স্বত্তাগত) নূর। অর্থাৎ নিজে প্রকাশ্য আর যাঁকে তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন তিনিও প্রকাশ্য হয়ে গেছেন। বাকী রইলেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অথবা ক্বোরআন শরীফ কিংবা ইসলাম অথবা ফেরেশতাগণ-আল্লাহর দানক্রমে ও তিনি বানিয়েছেন বলে নূর। অর্থাৎ তিনি হুযূর-ই আক্‌রামকে ও এ গুলোকে 'নূর' বানিয়েছেন। ফলে তিনি (হুযূর-ই আক্‌রাম) ও এগুলো 'নূর' হয়ে গেছেন। যেমন মহান রব হাক্বীক্বী তথা বাস্তবিকপক্ষে অনাদি ও অনন্তভাবে (ازلاً و ابدًا) সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞ ও সব বিষয়ে অবগত।

(سميع ,بصير , حى , عليم خبير) আর অন্যান্য সৃষ্টি তিনি বানিয়েছেন বিধায়, তাঁর দানক্রমে (سميع) (শ্রোতা), (بصير) (দ্রষ্টা), (عليم) (জ্ঞাতা) এবং (خبير) (অবগত)ও। আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য বলেছেন, اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (নিশ্চয় ওই মহান রব সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা)

[সূরা বনী ইস্রাঈল: আয়াত-১]

এ আয়াত শরীফে মহান রব নিজে নিজেকে (سَمِيْعٌ بَصِيْر) (সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা) বলেছেন। অন্য আয়াতে ইন্‌সান (মানবজাতি) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন-

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

তরজমা: নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত বীর্য থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করবো। অতঃপর তাকে শ্রবণকারী, দর্শনকারী করে দিয়েছি।

[৭৬:২, কান্‌যুল ঈমান]

সমস্ত গুণের এ অবস্থা যে, মহান রব নিজে নিজে, কারো দান ব্যতিরেকে এসব গুণে গুণান্বিত আর অন্য সৃষ্টি, দানক্রমে, মহামহিম রব সৃষ্টি করার কারণে এসব গুণে সাময়িকভাবে গুণান্বিত। শব্দ 'মুশ্‌তারাক' (একাধিক অর্থ বিশিষ্ট); কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে, প্রতিটি অর্থের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

পাঁচ. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'মহান রবের নূর' হওয়ার অর্থ এও নয় যে, হুযূর-ই আক্‌রাম আল্লাহর নূরের টুকরা, এও নয় যে, মহান রবের নূর হুযূর-ই আক্‌রামের নূরের হুবহু মৌলিক উপাদান, আবার এও নয় যে,

হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার মতো আযালী, আবাদী ও যাতী (অনাদি, অনন্ত ও স্বত্তাগত) নূর, এও নয় যে, মহান রব হুযূর-ই আক্বদাসের মধ্যে ছড়িয়ে গেছেন; এমনটি হয়েছে বলে কেউ বিশ্বাস করলে তার শির্ক ও কুফর অর্থাৎ তার মুশরিক ও কাফির হওয়া অনিবার্য (নিশ্চিত) হয়ে যাবে; বরং শুধু এর এ অর্থ যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, কোন মাধ্যম ছাড়া (بلا واسطه) মহান রবের নিকট থেকে ফয়য হাসিলকারী আর সমস্ত সৃষ্টি হুযূর-ই আক্‌রামের মাধ্যমে মহান রবের নিকট থেকে 'ফয়য' অর্জনকারী। যেমন- একটা চেরাগ থেকে অন্য চেরাগ জ্বালিয়ে, তারপর এ দ্বিতীয় চেরাগ থেকে হাজারো চেরাগ জ্বালিয়ে নিন। অথবা একটা শীশা (আয়না) সূর্যের সামনে রাখুন! ফলে তা চমকে উঠবে। তারপর সেটাকে ওইসব আয়নার দিকে করে নিন, যেগুলো অন্ধকার কামরায় রয়েছে। তখন সেটার প্রতিবিম্ব থেকে সমস্ত আয়না আলোকিত হয়ে যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম আয়নায় না সূর্য নেমে এসেছে, না সেটার টুকরা কেটে পড়ে আয়নার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে; বরং শুধু এমনটি হয়েছে যে, প্রথম আয়নাটা সরাসরি কোন মাধ্যম ছাড়া, সূর্য থেকে আলো অর্জন করেছে, আর অবশিষ্ট সব ক'টিই ওই আয়না থেকে। যদি এ প্রথম আয়না মধ্য ভাগে না হতো, তবে কামরাটার সব আয়না আলোহীন অন্ধকারই থেকে যেতো। এর উদাহরণ এটা বুঝে নিন যে, মহান রব হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে এরশাদ করেছেন-

وَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِى فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ

তরজমা: অতঃপর যখন আমি সেটাকে ঠিক করে নিই এবং সেটার মধ্যে আমার নিকট থেকে বিশেষ সম্মানিত রূহ ফুৎকার করে দিই, 'তখন সেটার নিমিত্তে সাজদাবনত হয়ে পড়ো।' [১৫:২৯, কান্‌যুল ঈমান]

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে এরশাদ করেছেন- وَرُوْحٌ مِّنْهُ (এবং তাঁরই নিকট থেকে একটি রূহ।) [৪:১৭১, কান্‌যুল ঈমান]

এ কারণে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে 'রূহুল্লাহ্' (আল্লাহ্ প্রদত্ত রূহ) বলা হয়। এর অর্থ এ নয় যে, 'হযরত আদম ও হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর রূহের টুকরা কিংবা অংশ; অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছেন'; বরং যথাক্রমে মাতা-পিতার ও পিতার মাধ্যম ছাড়া তাদেরকে মহান রব রূহ দান করেছেন। এভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'নূরুল্লাহ্' (আল্লাহর নূর) হওয়ার অর্থও এটাই যে, কোন মাখ্‌লূক্বের মাধ্যম ছাড়া তিনি মহান রবের নিকট থেকে ফয়য (কল্যাণধারা) পেয়েছেন ও পেয়ে থাকেন।

ছয়. এক হলো 'শাখ্সে মুহাম্মদী (شخص محمّدی) বা 'মুহাম্মদী ব্যক্তিত্ব' অপরটি হচ্ছে 'হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী' (حقیقت محمدی) অর্থাৎ 'মুহাম্মদী হাক্বীক্বত বাস্তবাবস্থা।' 'শাখসে মুহাম্মদী' হচ্ছে ওই পবিত্র শরীরের নাম, যা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধরদের মধ্যে, বিবি আমিনার পবিত্র গর্ভ থেকে এসেছে, সমস্ত নবী আলায়হিমুস্ সালাম-এর পর দুনিয়ায় এসেছে, যা এ বিশ্ব-জগতে বহুবিধ আত্মীয়তার সাথে সম্পৃক্ত। বিবি আমেনা খাতুনের চোখের আলো হওয়া, হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বার মাথার মুকুট হওয়া, হযরত ইব্রাহীম, তাইয়্যেব, তাহের ও ফাতিমা যাহ্রার মহান পিতা হওয়া- এ সব সম্পর্ক ওই 'শাখসে মুহাম্মদী'র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী।

বাকী রইলো- 'হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী'। এটা সম্মানিত সূফীগণের পরিভাষায়, শর্তহীন পবিত্র সত্তার প্রথম ঝলকের নাম। যেমন-উপমাহীনভাবে, এভাবে বুঝুন- আরবী ব্যাকরণ (ইলমে সরফ)-এর 'মাসদার' (ক্রিয়ামূল) থেকে গঠিত, প্রথম শব্দরূপের নাম (ماضی مطلق) (শর্তহীন অতীতকাল বাচক ক্রিয়াপদ), যা 'মাসদার' (ক্রিয়ামূল) থেকে গঠিত হয়। তারপর সমস্ত নির্গত ক্রিয়াপদ (مشتقات) এ ماضی مطلق (শর্তহীন অতীতকালবাচক ক্রিয়াপদ) থেকে গঠিত হয়। সুতরাং (ماضی مطلق) মাসদারের প্রথম ফসল (নির্গত ক্রিয়াপদ)। আর অন্যসব নির্গত ক্রিয়া এর পরবর্তী ফসল বা নির্গত শব্দাবলী।

মহান রব হলেন সমস্ত তাজাল্লী বা নূরের 'মাসদার' (উৎস)। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন ওই ماضی مطلق স্বরূপ, অর্থাৎ মহান রবের প্রথম 'তাজাল্লী' (আলোকচ্ছটা)। আর অবশিষ্ট সব সৃষ্টি পরবর্তী তাজাল্লী রাশির প্রকাশস্থল। 'শখসে মুহাম্মদী' সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে- قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

তরজমা: হে হাবীব! আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতো বশর।'

[১৮:১১০]

আর 'হাক্বীক্বতে মুহাম্মাদিয়্যাহ্' সম্পর্কে খোদ্ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন-

كُنْتُ نَبِيًّا وَ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَآءِوَالطِّيْن

অর্থ: আমি ওই সময় নবী ছিলাম, যখন (হযরত) আদম (আলায়হিস্ সালাম) পানি ও মাটির উপাদানে অবস্থান করছিলেন।

'হাক্বীক্বতে মুহাম্মাদিয়্যাহ' না আদম-সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত, না বশর, না 'মিস্লুকুম' (তোমাদের মতো), না কারো পিতা, না কারো সন্তান; বরং সমগ্র বিশ্বের মূল উৎস। প্রকাশ থাকে যে, 'বশরিয়াত' (মানব হওয়া)'র সূচনা হযরত

আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে হয়েছে। আর হুযূর-ই আক্রাম ওই সময়ও নবী, যখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর খামীরও তৈরী হয়নি। যদি ওই সময় ও ওই অবস্থায় হুযূর 'বশর' হন, তখন না হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম 'প্রথম বশর' হতেন, না 'আবুল বশর' (মানব জাতির পিতা) হতেন।

এখন যা 'নবী'র সংজ্ঞা দেওয়া হয়- 'নবী হলেন ওই মানব, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়তের বিধানাবলী পৌঁছানোর জন্য প্রেরণ করেছেন', তা হচ্ছে 'শাখসে নবী'র সজ্ঞা, 'হাক্বীক্বতে নবী' নবীর হাক্বক্বীত বা মূল অবস্থা'র নয়। হুযূর-ই আক্রাম তো 'নুবূয়ত' দ্বারা তখনো ভূষিত, যখন 'ইনসানিয়াত' (মানব হওয়া)'র 'নাম নিশানাও ছিলো না। কেননা, তখন প্রথম ইন্সান এবং সমস্ত মানবের পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম পয়দাও হননি; বরং 'ইনসান'-এর জন্য জরুরী জিনিষগুলো-সময় এবং স্থানও পয়দা হয়নি। হুযূর-ই আক্রামের 'নুবূয়ত' স্থান ও স্থানে অবস্থানকারী (مکان ومکین)-এরও পূর্বেকার।

বাদামের ছিলকাও বাদাম নামে পরিচিত এবং মগজও;কিন্তু ছিলকার বিধান অন্য প্রকারের, মগজের বিধান ভিন্নতর। আবার এটাও লক্ষণীয় যে, মগজ থাকে ছিলকার অভ্যন্তরে। অনুরূপ, 'হাক্বীক্বতে মুহাম্মাদিয়্যাহ' 'শখসে মুহাম্মাদী'তে আলোকদ্বীপ্ত থাকে। 'নূর হওয়া', 'বোরহান হওয়া' 'মহান রবের দলীল হওয়া' হচ্ছে এ হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীই এবং সেটারই গুণাবলী। এ বিষয়বস্তুকে মসনভী শরীফে অত্যন্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং দীর্ঘ পরিসরে বর্ণনা করা হয়েছে। মৌলভী আশরাফ আলী সাহেব তার 'নশরুত্ব ত্বী-ব' (نشر الطیب)-এ অতি উত্তমরূপে প্রমাণ করেছেন। তাফসীর-ই 'রূহুল বয়ান'-এ, সূরা আ'রাফ, পারা-৯-এ আয়াত- (هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ) (তিনি হলেন ওই মহান সত্তা, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'সমস্ত রূহ' 'রূহে মুহাম্মদী' থেকে সৃষ্ট।' সুতরাং হুযূর-ই আক্রাম হলেন 'আবুল আরওয়াহ্' (রূহগুলোর পিতা)।

সাত. হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর দেহ মুবারকের নূরানিয়াত (নূর হওয়া) (حِسِّیْ) (ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য)ও ছিলো, ফলে সাহাবা-ই কেরাম এবং হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র বিবিগণ ওই নূরানিয়্যাত আপন আপন চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর 'শামা-ইল' শরীফে হযরত হিন্দ ইবনে আবূ হালাহ থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেটাতে বর্ণিত হয়েছে-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْمًا يَتَلَأْلَأُ وَجْهُه كَتَلَأْلُأِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

অর্থঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহত্ব ঔজ্জ্বল্যমন্ডিত ছিলেন। তাঁর নূরানী চেহারা তেমন আলোকদীপ্ত ছিলো যেমন মাসের চতুর্দশ রাতের পরিপূর্ণ চাঁদ।

দারেমী শরীফে ইমাম দারেমী হযরত রুবায়্যি' বিনতে মু'আত্তভিয্ ইবনে আফরা থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَتْ يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَنَا رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً

অর্থঃ হে আমার বৎস! যদি তুমি ওই মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখতে, তবে উদিত সূর্যই দেখতে পেতে।

এই ইমাম দারেমী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ
اِذَاتَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ

অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সমুখস্থ দাঁত মুবারকগুলোর মধ্যবর্তীতে জানালা (ফাঁক) ছিলো। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন ওই দাঁত মুবারকগুলো থেকে আলো বের হতো।

কোন কোন রেওয়ায়তে আছে- ওই আলোকরশ্মি দ্বারা রাতে সুঁচ তালাশ করে নেওয়া হতো। আ'লা হযরত আলায়হির রাহমাহ্ বলেন- (পংক্তি)

سورں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے ترے رات کو صبح بنا دیتا ہے اوجالا تیرا

অর্থঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার হাসি থেকে উদ্ভাসিত নূর বা আলোতে হারিয়ে যাওয়া সুঁচ খুঁজে পাওয়া যায়। রাতকে ভোর করে দেয় আপনার উজালা।

তিরমিযী, আহমদ, বায়হাক্বী ও ইবনে হাব্বান হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

كَاَنَّ الشَّمْسُ تَجْرِىْ فِىْ وَجْهِهٖ

অর্থঃ তাঁর চেহারা মুবারকে যেন সূর্য চমকাতো।

'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়াহ্': ১ম খন্ডঃ পৃষ্ঠা ২৫১-তে 'নিহায়া' শরীফের বরাতে উদ্ধৃত হয়েছে-

وَكَانَ الْجِدَارُ تُلَاحِكُ وَجْهَهٗ

অর্থঃ তাঁর চেহারা-ই আন্ওয়ার-এ দেওয়ালের প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হতো।

শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভীঃ মাদারিজুন্নুবূয়তঃ ১ম খন্ডঃ পৃ-১১০-এ বলেছেন- ونمی افتاد آں حضرت را سایہ بر زمین

অর্থঃ হুযূর-ই আক্রামের ছায়া যমীনের উপর পড়তো না।

এ সব ক'টি বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আকরামের পবিত্রতম দেহের 'নূরানিয়াত' শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ অনুভব করতেন। হুযূর-ই আন্ওয়ারের চেহারা মুবারককে এ জন্য তাঁরা সূর্য ও চাঁদ বলে বুঝাতেন। অনুরূপ, দেহ মুবারকের ছায়া না থাকা, পবিত্রতম শরীর মুবারক থেকে এমন খুশ্বু প্রবাহিত হওয়া যে, অলিগলি পর্যন্ত খুশ্বুদার হয়ে যেতো- এগুলোও 'নূরানিয়াত'-এর কারণেই। মি'রাজ শরীফে শরীর মুবারক আগুন ও যামহারীর (বরফ)-এর বলয় অতিক্রম করে যাওয়া এবং ওই দু'টির প্রভাবে কোন অসুবিধা না হওয়া, সপ্ত আসমানের ভ্রমণ করা, যেখানে বাতাস নেই, অথচ জীবিত থাকা-এও এজন্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূর। আর এ নূরানিয়াত (নূর হওয়া) حِسّىْ (ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য)ও, عقلى (বিবেকগ্রাহ্য)ও। অনুরূপ, বক্ষ মুবারক বিদারণের সময় বক্ষ মুবারক থেকে হৃদয় শরীফ বের করে আনা এবং ফেরেশতাদের সেটাকে ধৌতকরা। এতদ্সত্ত্বেও হুযূর জীবিত থাকা- এ কারণে যে, হুযূর-ই আক্রাম নূর। অন্যথায় হৃদযন্ত্রের উপর সামান্যতম প্রভাব পড়লেও তা মৃত্যুর কারণ হয়ে যায়। এখনো আল্লাহর কোন কোন ওলী হুযূর-ই আক্রামের নূরকে কপালের চোখে দেখতে পান; যার পক্ষে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে।

যদি এ মূলনীতিগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া যায়, তবে অনেক উপকার হবে। আর মূল মাসআলাটা অনুধাবন করা (বুঝা) সহজ হয়ে যাবে। আজকাল বিরুদ্ধবাদীরা একথা বলে মানুষকে ধোঁকা দেয় যে, 'আল্লাহ্ নূর', যদি হুযূর-ই আক্রামও নূর হন, তবে তো হুযূর-ই আক্রামও রব হয়ে গেলেন।' কখনো বলে বেড়ায়- 'তোমরা যে বলছো, হুযূর আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্ট, তাহলে কি আল্লাহ্ হুযূর-ই আক্রামের মধ্যে সীমিত হয়ে গেছেন? নাকি আল্লাহর নূরের টুকরা কেটে তা থেকে হুযূরের সত্তা তৈরী করা হয়েছে?' কখনো কখনো বলে, 'খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে। আর তোমরা নবী আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহর নূর বলে বিশ্বাস করো। পুত্র বলে বিশ্বাস করা এবং নূর বলে মেনে নেওয়া এক কথা।' কখনো কখনো বলে বেড়ায়- 'যদি হুযূর-ই আক্রাম নূর হন, তবে তাঁর সমস্ত সন্তান-সন্ততিও নূর হওয়া চাই। কোন সাইয়্যেদ মানুষ (ইন্সান) থাকা সমীচিন হবে না।' যদি এ মূলনীতিগুলো স্মরণে থাকে, তবে এ সব ক'টি প্রশ্ন ও সংশয় আপসে দূরীভূত হয়ে যাবে।

জরুরী নোট

এ পুস্তক দু'টি অধ্যায়ে বিন্যস্থ করা হয়েছে- 'প্রথম অধ্যায়'-এ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'নূর হওয়া' এবং 'দ্বিতীয় অধ্যায়'-এ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'ছায়াহীন হওয়া'র সপ্রমাণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক অধ্যায়ে আবার দু'টি করে পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রত্যেক প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচ্য মাসআলার পক্ষে প্রামাণাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো উল্লেখপূর্বক সেগুলোর জবাব প্রদান বা খন্ডন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ‘নূর হওয়া’র বিবরণ

এ অধ্যায়ে দু’টি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ ‘প্রথম পরিচ্ছেদ’-এ নূর বিষয়ক মাসআলার প্রমাণাদি, আর ‘দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ’-এ এ মাসআলায় বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূর। আর সমস্ত মাখলূক্ব হুযূর-ই আক্রামের নূর থেকে সৃষ্ট। এর পক্ষে ক্বোরআনের আয়াতসমূহ, হাদীস শরীফসমূহ, ওলামা-ই দ্বীনের অভিমতসমূহ এবং খোদ্ দেওবন্দী-ওহাবীদের স্বীকারোক্তিগুলো সাক্ষী রয়েছে- দলীলগুলো নিম্নে প্রদর্শিত হলো। দেখুন, মহান রব আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

১. قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

তরজমাঃ নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট থেকে নূর এসেছে এবং সুস্পষ্ট কিতাব। [সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত-১৫]

২. مَثَلُ نُورِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ

তরজমাঃ মহান রবের নূর (অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপমা তেমনি, যেমন একটা থাক, যাতে চেরাগ (প্রদীপ) রয়েছে। ওই চেরাগ একটি ফানূসে রয়েছে। ওই ফানূস যেমন একটা চমকিত তারকা। [সূরা নূর: আয়াত-৩৫]

প্রথমোক্ত আয়াতে ‘নূর’ মানে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। যেমন আলো ছাড়া কিতাব পড়া যায় না, তেমনি হুযূর-ই আক্রাম ব্যতীত ক্বোরআন বুঝা যায় না। আর তিনি হলেন মহান রবের নূর; যা কেউ নেভাতে চাইলে নেভাতে পারে না, যেমন- সূর্য ও চন্দ্র ইত্যাদি। অনুরূপ, তাঁর নূরকে মাপা ও আন্দাজ-অনুমান করা যায় না; যেমনিভাবে সমুদ্রের পানি ও বাতাস।

দ্বিতীয় আয়াতেও 'আল্লাহর নূর' মানে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। কেননা, মহান রবের উপমা-উদাহরণ হতে পারে না। তিনি নিজে এরশাদ ফরমাচ্ছেন- لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَئٌ -তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই।

[সূরা শূরা, আয়াত-১১]

আর এখানে তো এ নূরের উপমা দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এটা দ্বারা হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথাই বুঝানো হচ্ছে।

৩. أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○
دَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ○

তরজমা: হে নবী, নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, হাযির-নাযির, সুসংবাদদাতা, ভয়ের বাণী শুনান এমন এবং আল্লাহর দিকে, তাঁরই নির্দেশে, আহ্বানকারী আর আলোকিতকারী সূর্যরূপে।

[সূরা আহযাব: আয়াত-৪৫ ও ৪৬, কান্‌যুল ঈমান]

ক্বোরআন শরীফ সূর্যকেও অন্যত্র 'সিরাজ-ই মুনীর' বলেছে। কেননা, তা নিজেও উজ্জ্বল, অন্যকেও চমকায়। আর চন্দ্র ও তারকারাজি ইত্যাদিকেও 'নূর' করে দেয়। কারণ, এগুলোর সব ক'টিই সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়। অনুরূপ, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকেও 'সিরাজ-ই মুনীর' বলেছেন। কারণ, হুযূর-ই আক্‌রাম নিজেও আলোকিত এবং সাহাবা-ই কেরামকেও 'নূর' করে দিয়েছেন। 'তাঁরাও হুযূর-ই আক্‌রাম-এর মাধ্যমেই চমকিত হয়েছেন ও হচ্ছেন।

৪. وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ط

তরজমা: কাফিরগণ এটা চাচ্ছে যে, আল্লাহর নূর (হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে তাদের মুখ দিয়ে নিভিয়ে ফেলবে। আর আল্লাহ্ আপন নূরকে পরিপূর্ণকারী; যদিও কাফিরগণ অপছন্দ করে। [সূরা সফ্: আয়াত-৮]

৫. يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ
إِلَّآ أَنْ يُتِمَّ نُورَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○

তরজমা: কাফিরগণ এটা চায় যে, আল্লাহর নূর (মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে তাদের মুখগুলো দিয়ে নিভিয়ে দেবে।

আর আল্লাহ্ তো মানবেন না, কিন্তু আপন নূরকে পরিপূর্ণ করা; যদিও অপছন্দ করে কাফিরগণ। [সূরা তাওবা: আয়াত-৩২]

এ শেষোক্ত আয়াতগুলোতে 'আল্লাহর নূর' মানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও হতে পারেন। কাফিরগণ চেয়েছিলো যে, হুযূর-ই আক্‌রামকে খতম করে ফেলবে; কিন্তু মহান রব হুযূর-ই আক্‌রামের প্রতিটি কাজকে পরিপূর্ণ করেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী 'মওদ্বূ'আত-ই কবীর'-এ বলেছেন, 'এ আয়াতগুলোতে 'নূরাল্লাহ্' (আল্লাহর নূর) মানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বলবে পাকের নূর।

সম্মানিত মুফাস্‌সিরগণের বাণীসমূহ

১. 'তাফসীর-ই জালালাঈন' শরীফে সূরা মা-ইদার আয়াত নম্বর ১৫-এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়-

قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ هُوَ نُوْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ এখানে 'নূর' মানে 'নূর-ই মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

২. 'তাফসীর-ই সাভী' শরীফে এ আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় রয়েছে-

قَوْلُهٗ هُوَ النَّبِيُّ اَىْ سُمِّىَ نُوْرًا لِاَنَّهٗ يُنَوِّرُ الْبَصَآئِرَ
وَيَهْدِيْهَا الرَّشَادَ وَلِاَنَّهٗ اَصْلُ كُلِّ نُوْرٍ حِسِّيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ

অর্থাৎ: মহান রব এ আয়াতে হুযূর-ই আক্‌রামকে 'নূর' এ জন্য বলেছেন যে, হুযূর-ই আন্‌ওয়ার অন্তর-চক্ষুগুলোকে নূরানী (আলোকিত) করে দেন এবং সাফল্যের দিকে পথ দেখান। আর হুযূর-ই আক্‌রাম হলেন প্রত্যেক ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য ও বিবেকগ্রাহ্য নূরের মূল।

৩. 'তাফসীর-ই খাযিন'-এ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়-

قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ يَعْنِىْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا سَمَّاهُ اللهُ
نُوْرًا لِاَنَّهٗ يُهْتَدٰى بِهٖ كَمَا يُهْتَدٰى فِى الظَّلَامِ بِالنُّوْرِ

অর্থাৎ এ আয়াতে 'নূর' হলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। মহান রব তাঁকে 'নূর' এ জন্য বলেছেন যে, হুযূর-ই আক্‌রাম থেকে হিদায়ত অর্জিত হয়; যেমনিভাবে অন্ধকারে 'নূর' দ্বারা পথের দিশা পাওয়া যায়।

৪. 'তাফসীর-ই বায়দ্বাভী' শরীফে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে-

قِيْلَ يُرِيْدُ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ: তাফসীরকারকদের একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এখানে 'নূর' মানে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ।

৫. 'তাফসীর-ই মাদারিক'-এ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে-

اَلنُّوْرُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهٗ يُهْتَدٰى بِهٖ كَمَا سُمِّيَ سِرَاجًا

অর্থাৎ 'নূর' মানে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, এ জন্য যে, হুযূর-ই আক্রাম থেকে হিদায়ত পাওয়া যায়; যেমনিভাবে মহান রব তাঁকে 'সূর্য' বলেছেন ।

৬. 'তাফসীর-ই ইবনে আব্বাস- তানভীরুল মিক্বইয়াস'-এ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে-

قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ رَسُوْلٌ يَعْنِىْ مُحَمَّدًا

অর্থাৎ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর নূর অর্থাৎ মহান রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এসেছেন ।

৭. 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান শরীফে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আছে-

وَقِيْلَ اَلْمُرَادُ بِالْاَوَّلِ هُوَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّانِىْ اَلْقُرْاٰنُ

অর্থাৎ: মুফাস্সিরদের কেউ বলেছেন যে, প্রথমোক্তটি অর্থাৎ 'নূর' মানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'কিতাব' মানে ক্বোরআন-ই করীম ।

৮. এ-ই 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'-এ আয়াতাংশ سِرَاجًا مُّنِيْرًا (উজ্জ্বলকারী সূর্য)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন-

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ اللهُ لَهٗ نُوْرًا فَاَرْسَلَهٗ اِلَى الْخَلْقِ

অর্থাৎ: আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর-ই আক্রামকে নূর বানিয়েছেন এবং সৃষ্টির দিকে প্রেরণ করেছেন ।

৯. 'তাফসীর-ই বায়দ্বাভী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

وَيُقْتَبَسُ مِنْ نُّوْرِهٖ اَنْوَارُ الْبَصَآئِرُ

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রামের নূর থেকে অন্তরচক্ষুগুলোর নূর অর্জন করা যায় ।

১০. এরই কাছাকাছি তাফসীর-ই খাযিন ইত্যাদিতেও উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন 'তাফসীর-ই খাযিন'-এ উপরিউক্ত আয়াত مَثَلُ نُوْرِهٖ-এর তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَقِيْلَ قَدْ اَتٰى هٰذَا التَّمْثِيْلُ لِلنُّوْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ لِكَعْبِ الْاَحْبَارِ اَخْبِرْنِىْ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا

مِصْبَاحٌ قَالَ كَعْبٌ هٰذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمِشْكٰوةُ صَدْرُهٗ وَالزُّجَاجَةُ قَلْبُهٗ وَالْمِصْبَاحُ فِيْهِ النُّبُوَّةُ تُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ هِىَ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ يَكَادُ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمْرُهٗ يَتَبَيَّنُ لِلنَّاسِ وَلَوْلَمْ يَتَكَلَّمْ

অর্থাৎ: মুফাস্সিরদের কেউ কেউ বলেছেন যে, এ আয়াতে 'হুযূর-ই আক্রামের নূর'-এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে । হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস কা'বে আহ্বারকে এ আয়াত- 'তাঁর নূরের উপমা...' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন । তদুত্তরে কা'বে আহ্বার বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ উপমা আপন নবীরই দিয়েছেন । সুতরাং 'থাক' হলো হুযূর-ই আক্রামের বক্ষ মুবারক, 'ফানুস' হলো হুযূর-ই আক্রামের হৃদয় মুবারক । তাতে রয়েছে, 'নুবূয়তের চেরাগ' । আর 'বরকতমন্ডিত গাছ' হলো নুবূয়তের গাছ । অর্থাৎ এটা সন্নিকটে যে, নূর-ই মুহাম্মদী' চমকে উঠবে, লোকদের সামনে প্রকাশ পেয়ে যাবে, যদিও মুখে কথা না বলেন ।

১১. 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান' শরীফে لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ -এর ব্যাখ্যায় আছে যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বয়স কত? তিনি আরয করলেন, "এটা তো আমার জানা নেই, তবে আমি এতটুকু জানি যে, আসমানের চতুর্থ হিজাবে একটা তারকা (নক্ষত্র) সত্তর হাজার বছর পর পর উদিত হতো । সেটাকে আমি বাহাত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি ।" তখন হুযূর-ই আক্রাম বললেন, "হে জিব্রাঈল, মহান রবেরই শপথ! ওই তারকা (নক্ষত্র) হলাম আমিই ।" আর মহান রব হুযূর-ই আক্রামের নূরকে হযরত আদমের পৃষ্ঠ মুবারকে আমানত (গচ্ছিত) রেখেছিলেন । 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'- এর এ ইবারত থেকে বুঝা যায় যে, নূরে মুহাম্মদী হযরত জিব্রাঈলের অনেক আগে সৃষ্টি হয়েছিলো, যখন আসমান, যমীন, চাঁদ, সূর্য কিছুই ছিলো না ।

---o---

হাদীস শরীফসমূহের আলোকে
হুযূর-ই আক্‌রাম নূর

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান রবের 'নূর' হওয়ার পক্ষে অগণিত হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে; তন্মধ্যে কয়েকটা অতি সংক্ষেপে পেশ করা হলো-

এক. ইমাম আবদুর রায্‌যাক্ব আপন 'মুসনাদ'-এ হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রসূল, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন, আমাকে বলুন, সব জিনিষের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা কি সৃষ্টি করেছেন?" হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করলেন, "হে জাবির, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জিনিষের পূর্বে তোমার নবীর নূরকে আপন নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর ওই নূর আল্লাহর ক্বুদরতে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে, ভ্রমণ করতে থাকে। তখন না লওহ ছিলো, না কলম ছিলো, না ছিলো জান্নাত, না ছিলো দোযখ; না ছিলো ফেরেশতা; না আসমান ও যমীন ছিলো, না চন্দ্র ও সূর্য ছিলো; না জিন্ ছিলো, না ইনসান। অতঃপর যখন মহান রব অন্যান্য মাখলূক্ব সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন ওই নূরকে চার ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ দ্বারা কলম, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা লওহে মাহ্‌ফূয, তৃতীয় ভাগ দ্বারা আরশ ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন।...

এ হাদীস শরীফ অতি দীর্ঘ। এ হাদীস ইমাম বায়হাক্বী 'দালা-ইলুন্ নুবূয়ত'-এ বর্ণনা করেছেন। আর দ্বীনের বড় বড় ইমামগণ এ হাদীসের সনদের উপর নির্ভর করেছেন; যেমন- ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়া'য়, ইমাম ইবনে হাজর মক্কী 'আফদ্বালুল ক্বোরা'য়, আল্লামা ক্বাসী 'মাত্বা-লি'উল মুসার্‌রাত'-এ, আল্লামা যারক্বানী 'শরহে মাওয়াহিব'-এ এবং আল্লামা শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী তাঁর 'মাদারিজুন্নুবূয়ত'-এ (এ হাদীস নির্ভরযোগ্য সনদ বা সূত্রে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন)।

দুই. সর্ব ইমাম আহমদ, বায়হাক্বী ও হাকিম সহীহ সনদে হযরত ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়াহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আমি মহান রবের নিকট 'খাতামুন্ নবিয়্যীন' হিসেবে ছিলাম; অথচ তখনও (হযরত) আদম (আলায়হিস্ সালাম) আপন খামীরে অবস্থান করছিলেন। [মিশ্‌কাত শরীফ]

তিন. তিরমিযী শরীফ, ইমাম আহমদ, ইমাম হাকিম ও ইমাম বোখারী আপন 'তারীখ'-এ এবং ইমাম আবূ নু'আয়ম 'হুলিয়া'য় হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, আর ইমাম হাকিম এ রেওয়াতকে সহীহ্ বলেছেন, একবার সাহাবা-ই কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে

আল্লাহর রসূল, 'আপনার জন্য নুবূয়ত কখন সাব্যস্ত হয়েছিলো?" তিনি এরশাদ করলেন, "যখন (হযরত) আদম আলায়হিস্ সালাম রূহ ও শরীরের মধ্যভাগে ছিলেন।"

চার. আহকাম-ই ইবনুল ক্বাহত্বান হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে, তিনি আপন পিতা হযরত ইমাম হোসাঈন রাদ্বিযাল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে, তিনি তাঁর পিতা হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি আদম আলায়হিস্ সালাম-এর জন্মের চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আপন রবের মহান দরবারে এক নূর ছিলাম।"

পাঁচ. হযরত আবূ সুহায়ল ক্বাত্তান আপন কিতাব 'আমালী'তে সুহায়ল ইবনে সালেহ হামদানী থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (অর্থাৎ ইমাম বাক্বির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে জিজ্ঞাসা করলাম, "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো সব শেষে প্রেরিত হয়েছেন, তিনি সকল নবীর অগ্রণী হলেন কীভাবে?" তখন ইমাম মুহাম্মদ বাক্বির বলেন, "যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম-সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে 'মীসাক্ব' বা অঙ্গিকার দিবসে বের করলেন, তখন সবার পূর্বে জবাবে بَلٰى (হাঁ, কেন নন? অবশ্যই) হুযূর-ই আক্‌রামই বলেছিলেন।"

ছয়: হযরত আব্বাস নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করেছিলেন, "আমাকে কিছু না'ত শরীফ পড়ার অনুমতি দিন!" হুযূর-ই আক্‌রাম বললেন, "হাঁ, পড়ুন!" তখন তিনি একটি না'তিয়া ক্বসীদাহ্, (হুযূর-ই আক্‌রামের প্রশংসা ভরা কবিতা) পড়লেন, যা'তে দু'টি পংক্তি এ'ও ছিলো-

وَاَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَّ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ وَاَضَاءَ تْ بِنُوْرِكَ الْاُفُقُ
فَنَحْنُ فِيْ ذٰلِكَ الضِّيَآءِوَفِى النُّوْرِ سَبِيْلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ

অর্থাৎ: যখন আপনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, তখন আপনার নূরে যমীন ও আসমানের প্রান্তগুলো (দিগন্ত) চমকে উঠেছিলো। তখন থেকে আমরা ওই নূর বা আলোতে রয়েছি এবং তা দ্বারা হিদায়তের পথ অতিক্রম করছি।

এ সব ক'টি রেওয়ায়ত মৌং আশরাফ আলী সাহেব তার কিতাব 'নশরুত্ব ত্বী-ব' (نشر الطيب)-এ অতি স্পষ্টভাবে ও ব্যাখ্যাসহকারে উল্লেখ করেছেন। 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়া' শরীফেও এ রেওয়াতগুলো উদ্ধৃত হয়েছে।

সাত. 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়া' শরীফ: ১ম খন্ড: ৫ম পৃষ্ঠায় আছে- ইমাম আবূ সা'ঈদ নিশাপুরী হযরত কা'বুল আহবার থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন নূর-ই মুহাম্মদীকে খাজা আবদুল মুত্তালিব পেয়েছিলেন, তখন তাঁর শরীর থেকে মেশকের খুশ্‌বু ছড়াচ্ছিলো। আর নূর-ই মুহাম্মদী তাঁর কপালে চমকাচ্ছিলো। হযরত আবদুল মুত্তালিবের দো'আ তখন এভাবে কবূল হচ্ছিলো যে, মক্কাবাসীরা তাঁকে সামনে রেখে বৃষ্টির জন্য দো'আ করতো। তখন তাৎক্ষণিকভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হতো। এ নূরের কারণে আবরাহার হাতীগুলো খাজা আবদুল মুত্তালিবকে সাজদা করেছিলো।

আট. হযরত আবূ নু'আয়ম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীমের বেলাদত শরীফের রাতে হযরত আমেনা খাতুনের ঘরে বেহেশতী হুরে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো। হযরত আসিয়া ও বিবি মরিয়ম আর হযরত আমেনা হুযূর-ই আক্‌রামের পবিত্র জন্মের সময় এমন নূর-ই মুহাম্মদী দেখেছেন যে, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছিলো। তারপর হুযূর-ই আক্‌রাম ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হওয়া মাত্র তিনি সাজদাবনত হন।

[মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়া শরীফ, পৃ. ২১]

মোটকথা, হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'নূর' হওয়া অনেক হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত। এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটামাত্র উদ্ধৃত হলো। আর 'ভূমিকা'য় আরো কয়েকটা উল্লেখ করা হয়েছিলো।

---o---

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূর সম্পর্কে ওলামা-ই ইসলাম-এর অভিমতসমূহ

সব সময় মুসলিম উম্মাহ্‌র এ আক্বীদা বা বিশ্বাস চলে আসছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান রবের নূর। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত ছিলোনা। (এ মাসআলায় কারো মতবিরোধ সামনে আসেনি।) উম্মতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের কিছু অভিমত নমুনাস্বরূপ পেশ করা হলো-

এক. হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার কবিতার পংক্তি আমি হাদীসগুলোর পরম্পরায় আরয করেছি। ওই পংক্তিতে তিনি হুযূর-ই আক্‌রামকে 'নূর' বলেছেন। আর তিনি তা খোদ্ হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার-ই পাকে তাঁর সামনে পড়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন আপত্তি করেননি।

দুই. হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বাণী আমি ভূমিকায় আরয করেছি। হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা-ই আন্‌ওয়ারে সূর্যের মতো চমক ছিলো।

তিন. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বাণীও ভূমিকায় পেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে- হুযূর-ই আন্‌ওয়ারের দাঁত মুবারক থেকে 'নূর' উদ্ভাসিত হচ্ছিলো বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

চার. হযরত হিন্দ ইবনে আবূ হালাহ্‌র অভিমতও ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। হুযূরই আক্‌রামের চেহারা-ই আন্‌ওয়ার এমন আলোকিত ছিলো যেন পূর্ণিমার চাঁদ।

পাঁচ. হযরত রুবাইয়্যি' বিনতে মু'আওভিয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বাণীও ভূমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "যদি তুমি তাঁকে দেখতে, তবে তুমি জানতে যে, সূর্য উদয় হচ্ছে।"

ছয়. হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'মাদারিজুন্নুবূয়ত': ১ম খন্ডের ৫ম অধ্যায়: ১১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন-

وچوں آں حضرت عین نور باشد نور راسایہ نمی باشد

অর্থ: যেহেতু হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একেবারে আপাদমস্তক শরীফ নূর ছিলেন, সেহেতু নূরের ছায়া হয় না।

সাত. হযরত মাওলানা আলী ক্বারী তাঁর 'মাওদ্বূ-'আত-ই কবীর'-এর ৮৬ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

وَاَمَّا نُوْرُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهُوَ فِىْ غَايَةٍ مِّنَ الظُّهُوْرِ شَرْقًا وَغَرْبًا وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرُهٗ وَسَمَّاهُ فِى كِتَابِهٖ نُوْرًا

অর্থ: কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে (দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত) চূড়ান্তভাবে চমকাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আপন কিতাবে 'নূর' বলেছেন।

আট. এ-ই মোল্লা আলী ক্বারী আলায়হি রাহমাতুল্লাহিল বারী তাঁর এ-ই 'মওদ্বূ-'আত'-এ একই জায়গায় বলেছেন-

قَالَ تَعَالٰى : اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَلٰى مِثْلِ نُوْرِهٖ قَلْبُ مُحَمَّدٍ

অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন: আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের 'নূর'। আল্লাহর এ নূরের উপমা হচ্ছে- আল্লাহর এ নূর হলো হুযূর-ই আক্রামের হৃদয়।"

নয়: ইমাম বূ-সীরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'ক্বসীদাহ্-ই বোর্দাহ্' শরীফে লিখেছেন-

فَاِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا ـ يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِى الظُّلَمِ

অর্থ: হে আল্লাহর হাবীব, আপনি হলেন বুযুর্গী বা মর্যাদার সূর্য। আর সমস্ত নবী আলায়হিমুস্ সালাম হলেন সেটার তারকারাজি, যেগুলো সেটার আলোরাশিকে অন্ধকাররাশিতে লোকজনের মধ্যে প্রকাশ ও প্রসার করছে।

দশ. ইমাম জালাল উদ্দীন রূমী ক্বুদ্দিসা সির্‌রুহুল আযীয তাঁর 'মসনভী' শরীফে বলেন-

عکس نور حق ہمہ نوری بود- عکس دورار حق ہمہ دوری بود

ایں خورد گردد پلیدی ریں جدا- آں خورد گردد ہمہ نورِ خدا

অর্থ: ১. আল্লাহর নূরের ছায়াও নূর হয়। যারা আল্লাহর নিকট থেকে দূরে থাকে তাদের ছায়াও দূরে থাকে।

২.আমরা যা খাই, তা নাপাক আবর্জনা হয়ে বের হয়। আর যা হুযূর-ই আক্রাম আহার করেন তার সবই আল্লাহর নূর হয়ে যায়।

এগার. ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ক্বাস্তালানী ক্বুদ্দিসা সির্‌রুহু তাঁর 'মাওয়া-হিব-ই লাদুন্নিয়াহ্' শরীফের প্রথম খন্ডের ৯ম পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

قَالَ تَعَالٰى يَا اٰدَمُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهٗ فَرَاٰى نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سُرَادِقِ الْعَرْشِ قَالَ يَارَبِّ مَا هٰذَا النُّوْرُ قَالَ هٰذَا نُوْرُ نَبِىٍّ مِّنْ ذُرِّيَّتِكَ اِسْمُهٗ فِى السَّمَاءِ اَحْمَدُ وَفِى الْاَرْضِ مُحَمَّدٌ لَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ وَلَا خَلَقْتُ سَمَاءً وَلَا اَرْضًا

অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করলেন, "হে আদম, তোমার মাথা উঠাও! অতঃপর তিনি তাঁর মাথা উঠালেন। তখন তিনি আরশের পর্দাগুলোতে একটা নূর দেখতে পেলেন। তিনি আরয করলেন, "হে আমার রব! এ কেমন নূর?" তিনি এরশাদ করলেন, "এ নূর হচ্ছে এক নবীর, যিনি তোমার সন্তানদের মধ্যে হবেন। তাঁর নাম আসমানে 'আহমদ' এবং যমীনে 'মুহাম্মদ'। যদি তিনি না হতেন, তবে না আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম, না আসমান ও যমীন পয়দা করতাম।

বার. এ-ই ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ক্বাস্তলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ-ই 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়া'র ৮ম পৃষ্ঠায় বলেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا خَلَقَ نُوْرَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى اَنْوَارِ الْاَنْبِيَاءِ فَغَشَّهُمْ مِنْ نُوْرِهٖ فَاَنْطَقَهُمُ اللّٰهُ بِهٖ فَقَالُوْا يَا رَبَّنَا مَنْ غَشَّنَا نُوْرُهٗ ـ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذَا نُوْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِنْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ جَعَلْتُكُمْ اَنْبِيَاءَ

অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরকে সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি ওই নূরকে নির্দেশ দিলেন, যেন সমস্ত নবীর নূরকে দেখেন। সুতরাং মহান রব হুযূর-ই আন্‌ওয়ারের নূর দ্বারা সমস্ত নবীর নূরকে ঢেকে ফেললেন। তখন তিনি ওইসব নূরকে কথাবলার শক্তি দান করলেন। তখন তাঁরা সবাই বলতে লাগলেন, "হে খোদা! কার নূর আমাদেরকে ঢেকে ফেলেছে?" তদুত্তরে মহান রব বললেন, "এটা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর নূর। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। যদি তোমরা তাঁর উপর ঈমান নিয়ে এসো, তবে আমি তোমাদেরকে নবী বানাবো।"

তের. আল্লামা যারক্বানী আলায়হির রাহমাহ্ হযরত জাবিরের হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

مِنْ نُوْرِهٖ اَىْ مِنْ نُوْرٍ هُوَ ذَاتُهٗ

অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরকে ওই নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ ওই নূর থেকে, যা স্বয়ং আল্লাহর সত্তা-ই।

চৌদ্দ. ইমাম আহমদ ক্বাস্তলানী 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়া' শরীফে বলেন-

لَمَّا تَعَلَّقَتْ اِرَادَةُ الْحَقِّ تَعَالٰى بِاِيْجَادِ خَلْقِهٖ اَبْرَزَ الْحَقِيْقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ مِنْ اَنْوَارِهِ الصَّمَدِيَّةِ فِى الْحَضْرَةِ الْاَحَدِيَّةِ ثُمَّ سَلَخَ مِنْهَا الْعَوَالِمَ كُلَّهَا عُلْوَّهَا وَسِفْلَهَا

অর্থ: যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাখলূখদের সৃষ্টি করতে চাইলেন তখন তিনি হাক্বীক্বতে মুহাম্মদীকে তাঁর চিরস্থায়ী নূররাশি থেকে তাঁর একক সত্তার সামনে প্রকাশ করলেন, তা থেকে সমস্ত উর্ধ্ব ও নিম্ন জগৎকে বের করলেন।

পনের. 'মাত্বালিউল মুসার্‌রাত' শরহে 'দালা-ইলুল খায়রাত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

قَدْ قَالَ الْاَشْعَرِىُّ اِنَّهٗ تَعَالٰى نُوْرٌ لَيْسَ كَالْاَ نْوَار وَرُوْحُ النَّبَوِيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ لُمْعَةٌ مِّنْ نُوْرِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ اَشْرَارُ تِلْكَ الْاَنْوَار وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ وَمِنْ نُوْرِىْ خَلَقَ كُلَّ شَئٍ وَغَيْرَهٗ مِمَّا فِىْ مَعْنَاهُ

অর্থ: ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নূর, কিন্তু অন্য কোন নূরের মতো নন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রুহ শরীফ ওই নূরেরই ঝলক এবং ফেরেশতাগণ হলেন ওই নূররাশির ফুল। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূরকে পয়দা করেছেন। আর আমার নূর থেকে প্রতিটি জিনিষ সৃষ্টি করেছেন।"

এতদ্ব্যতীত আরো বহু হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর আলোচ্য বিষয় একই।

ষোল. আল্লামা শাহ্ আবদুল গণী নাবলূসী তাঁর 'হাদীক্বাতুন্ নাদিয়্যাহ্' শরহে 'ত্বরীক্বাহ্-ই মুহাম্মাদিয়্যাহ'য় লিখেছেন-

قَدْ خُلِقَ كُلُّ شَئٍ مِنْ نُوْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَمَا وَرَدَ بِهٖ اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ

অর্থ: প্রতিটি বস্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; যেমন সহীহ্ হাদীসে একথা বর্ণিত হয়েছে।

---o---

খোদ্ দেওবন্দী আলিমদের অভিমতসমূহ

এক. দেওবন্দীদের নেতা মৌলভী আশরাফ আলী সাহেব থানভী তার কিতাব 'নাশ্‌রুত্ব ত্বী-ব' (نشر الطيب)-এ আলোচ্য বিষয়কে এভাবে আরম্ভ করেছেন- 'প্রথম পরিচ্ছেদ' 'নূর-ই মুহাম্মদী'র বর্ণনায়। এ পরিচ্ছেদে তিনিও নূরের ওই সব হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেগুলো আমি 'হাদীস শরীফগুলোর বর্ণনা'য় উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে তিনি (থানভী সাহেব) বলেন-

(ف) اس حدیث سے نور محمدی ﷺ کا ... ما باولیت حقیقت ... ثابت ہوا- کیونکہ جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی سے متأخر ہو ... ما اس حدیث میں منصوص ہے (...)

অর্থ: এ হাদীস শরীফ থেকে 'নূরে মুহাম্মদী' সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়া 'হাক্বীক্বত প্রথমে হওয়া' থেকে প্রমাণিত হয়। কেননা, যে সব বস্তু সম্পর্কে রেওয়ায়তগুলোতে 'প্রথম সৃষ্টি হওয়া'র কথা এসেছে, ওইসব বস্তু 'নূর-ই মুহাম্মদী'র পরে সৃষ্ট হওয়া এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। [এ পর্যন্ত শেষ]

এ থেকে উক্ত মৌলভী সাহেব দু'টি বিষয় মেনে নিয়েছেন- ১. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'নূর' হওয়া এবং ২. হুযূর-ই আক্রামের নূর সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট হওয়া। আর প্রতিটি বস্তু তাঁর নূর থেকে সৃষ্ট হওয়াও উক্ত মৌলভী সাহেব ওই কিতাবে এ স্থানে স্বীকার করে নিয়েছেন। দেখুন, বর্তমানকার দেওবন্দী-ওহাবীগণ তাদের পেশোয়ার উপর কি ফাত্ওয়া আরোপ করছেন?

এ-ই মৌলভী আশরাফ আলী সাহেব তার কিতাব 'সালজুস্ সুদূর'-এ লিখেছেন-

در شعاع بے نظیرم لاشوید - ورنہ پیش نور من رسوا شوید

অর্থ: আমার অনুপম আলোর পতিবিম্বের সামনে বিলীন ও হারিয়ে যাও, অন্যথায় আমার নূরের সামনে অপমানিত-লাঞ্ছিত হয়ে যাবে।

এ-ই মৌলভী আশরাফ আলী সাহেব তার কিতাব 'সালজুস্ সুদূর'-এর অন্য এক জায়গায় নিজেই লিখেছেন-

نبی خود نور اور قرآں ملا نور - نہ ہو پھلکے کیوں نور علی نور

অর্থ: নবী হলেন নিজে নূর আর ক্বোরআনও পেয়েছেন নূর। এ উভয়টি মিলে কেন হবেন না-নূরের উপর নূর? (অবশ্যই।)

শাহ্ আবদুর রহীম সাহেব অর্থাৎ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ সাহেবের পিতা মহোদয় আপন কিতাব 'আনফাস-ই রহীমিয়াহ্'য় লিখেছেন-

از عرس، یہ تا فرس و ملائکہ عاوی و جنس سفلی ہمہ، پاشی از اں حقیقت محمدیہ اسیت و قول رسول مقبول اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِیْ وَخَلَقَ اللهُ مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ نُوْرِی وَقَوْلُ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ وَقوله لَوْلَاكَ لَمَا أَظْهَرْتُ رُبُوْبِيَّتِیْ

অর্থ: ফরশ থেকে আরশ পর্যন্ত এবং উর্ধ্বজগতের ফেরেশতাগণ ও নিম্নজগতের সব জাতির বস্তু- সবই হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী (হুযূর-ই আক্রামের নূর) থেকে সৃষ্ট। হুযূর-ই আক্রামের এরশাদ হলো- 'সব কিছুর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।' আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যদি আপনি না হতেন, তবে আমি আসমানসমূহ সৃষ্টি করতাম না'; আর যদি আপনি না হতেন, তাহলে আমি আমার রাবূবিয়াতকে প্রকাশ করতাম না'।

ওহাবী দেওবন্দী দলের ইমাম (গুরু ঠাকুর) মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী আপন কিতাব 'মানসাব-ই ইমামত'-এর ১৬শ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

کہ اے کسیکہ بے بصر اسیت البتہ از نور افشاں او بے خبر اسیت

অর্থ: অবশ্য, যে ব্যক্তি অন্ধ সে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সমুজ্জ্বল নূর সম্পর্কে বে-খবর (অনবহিত)।

এ-ই মৌলভী ইসমাঈল সাহেব দেহলভী তার এ কিতাব 'মানসাব-ই ইমামত'-এর অন্য জায়গায় লিখেছেন-

اما ۔ یہ رول ۔ برکت پیش آںکہ وجود ۔ ۔ مہ علیہ آفتاب عالم ۔ یہ اب اسیت
کہ چوں نور او در تمام عالم منتشود، لابد ظلمت ۔ ۔ ب بدر رود

অর্থ: কিন্তু বরকত নাযিল হওয়া। এর বর্ণনা এ যে, সম্মানিত নবীগণের অস্তিত্ব দুনিয়াকে উজ্জ্বলকারী সূর্যের মতোই। অর্থাৎ যখন সেটার আলো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন রাতের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়।

মৌলভী হোসাঈন আহমদ সাহেব নিজের ও তার সমস্ত দেওবন্দী আলিমের আক্বীদা তার কিতাব 'আশ্-শিহাবুস্ সাক্বিব': পৃ. ৫০-এ এভাবে বর্ণনা করেছেন-

ہمارے اکابر کے اقوال و عقائد کو ملاحظہ فرمایئے یہ جملہ حضرات ذات حضور پرنور علیہ السلام کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک منبع فیوضات الٰہیہ و سراب خیر رحیم ۔ ۔ ماہیہ اعتقاد لے بیٹھے ہوئے ہیں - ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ازل سے ابتک جو جو رحمتیں عالم پر ہوئی ہیں اور ہوں گی عام ہے کہ وہ نعمت وجود کی ہو یا اور کسی قسم کی ان سب میں آپ کی ذات پاک اسی طرح پر

واقع ہوئی ہے کہ پہلے آفتاب سے نور چاند میں آیا اور چاند نور سے ہزاروں آئینوں میں غرضیکہ حقیقت محمدیہ واسطہ کمالات عالم و عالمیاں ہے غرض حقیقت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام واسطہ جملہ کمالات عالم و عالمیاں ہے یہی معنی لَوْلَاكَ خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ اور اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِیْ اور اَنَا نَبِیُّ الْاَنْبِیَآءِ کے ہیں۔

অর্থ: আমাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অভিমত ও আক্বাইদ দেখুন। সব হযরত হুযূর পুরনূর আলায়হিস্ সালামকে সবসময় থেকে সব সময় পর্যন্ত আল্লাহর ফুয়ূযাত ও অশেষ রহমতের ঝলক বলে বিশ্বাস করে বসে আছেন। তাঁদের আক্বীদা হচ্ছে অনাদিকাল থেকে যে যে রহমতই বিশ্বের উপর বর্ষিত হয়েছে এবং হবে, চাই ওই নি'মাত অস্তিত্বের হোক কিংবা অন্য কোন প্রকারের হোক, ওই সব ক'টিতে তাঁর পবিত্র সত্তা ওইভাবে আপতিত হয়েছে, যেমন- প্রথমে সূর্য থেকে আলো চাঁদে এসেছে, আর চাঁদ থেকে নূর হাজারো আয়নার মধ্যে। মোটকথা, হাক্বীক্বতে মুহাম্মাদিয়্যাহ্ বিশ্ব ও বিশ্ববাসীদের সমস্ত কামালাত (পূর্ণতা)-এর মাধ্যম। মোটকথা, হাক্বীক্বতে মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ওয়াত্ তাহিয়্যাহ্ই বিশ্ব ও বিশ্ববাসীদের সমস্ত কামাল বা গুণের মাধ্যম। এটাই হচ্ছে- 'আপনি না হলে আমি (আল্লাহ) আসমানগুলোকে সৃষ্টি করতাম না', 'আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন' এবং 'আমিই হলাম নবীগণের নবী'-এর মর্মার্থ।

দুই. দেওবন্দীদের সবার ও সাধারণ নেতা মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেব তাঁর 'ইমদাদুস্ সুলূক'-এর পৃ. ৮৫-তে লিখেছেন-

ازیں جا اسیت کہ حق تعالیٰ در شان حبیب خود صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ کہ البتہ آمدہ نزد شما از طرف حق تعالیٰ نور و کتاب مبین و مراد از نور ذات پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسیت و نیز او تعالیٰ فرماید کہ ایہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترا شاہد و مبشر و نذیر و داعی الی اللہ تعالیٰ و سراج منیر فرستادہ ایم و منیر روشن کنندہ و نور دہندہ را گویند

অর্থাৎ: এ-ই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রসঙ্গে (শানে) বলেছেন- "তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে নূর ও কিতাবে মুবীন (উজ্জ্বলকারী কিতাব) এসেছে।" এখানে 'নূর' মানে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা। অনুরূপ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'হে নবী

(সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বলকারী সূর্য বানিয়ে প্রেরণ করেছি। 'মুনীর' 'আলোকিতকারী' এবং 'আলোকদাতা'কে বলা হয়।

এ ইবারতে মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেব তিনটি কথা বলেছেন- ১. হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার নূর, ২. আয়াত শরীফ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ-এর মধ্যে 'নূর' মানে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ৩. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুধু নূরই নন, বরং مُنِيْر (অর্থাৎ নূরে পরিণতকারী)ও। তিনি আপন অনুসারী গোলামদেরকে 'নূর' করে দেন। হুযূর-ই আক্‌রাম সূর্য, যা রাতে চাঁদ ও তারাগুলোকে এবং দিনে কণাগুলোকে আলোকিত-চমকিত করে দেয়। এখন কোন দেওবন্দীর অধিকার নেই- এ তিনটি বিষয়কে অস্বীকার করার। কারণ, তাদের নেতা, তাদের সবার পথ-প্রদর্শক ও তথাকথিত বরহক্ব সাহেব এসব ক'টি বিষয় মেনে নিয়েছেন।

তিন. এ-ই মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেব তাঁর কিতাব 'ইমদাদুস্ সুলূক'-এর ৮৬তম পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

وحضرت صلوه ی الله علیه فرموده که حق تعالی مرا از نور خود پیدا فرمود و مؤمنین از نور من پیدا فرمود

অর্থ: হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর নূর থেকে পয়দা করেছেন। আর মুসলমানদেরকে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।

চার. এ মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেবই এ 'ইমদাদুস্ সুলূক'-এর ৮৬ পৃষ্ঠায় একটু পরে এভাবে লিখেছেন-

آں دا پاک صلی الله علیه وسلم هم از جمله اولاد آدم اند مگر آنحضرت صلی الله علیه وسلم خود
را چناں مطهر فرمود که نور خالص وگشتند و حق تعالی آنجناب را نور فرمود و بتواتر ثابت شد که
آنحضرت صلی الله علیه وسلم سایه نداشتند و ظاهر است که بجز نور همه اجسام ظل می دارند

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেকে এমনভাবে পাক-পবিত্র করে নিয়েছেন যে, তিনি খাঁটি নূর হয়ে গেছেন আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে 'নূর' বলেছেন। একথা 'হাদীস-ই মুতাওয়াতির' (প্রতিটি যুগে এত বেশী বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যে, তা মিথ্যা বা বানোয়াট হবার কোন সম্ভাবনা নেই) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া ছিলোনা। প্রকাশ থাকে যে, নূর ব্যতীত সমস্ত দেহের ছায়া আছে।

এ ইবারতেও মৌলভী সাহেব দু'টি বিষয় মেনে নিয়েছেন; ১. হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূর; মহান রব তাঁকে 'নূর' বলেছেন এবং ২. হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্রতম শরীরের ছায়া ছিলোনা। অর্থাৎ তাঁর 'নূরানিয়াত' (নূর হওয়া) কোন কোন দিক থেকে ইন্দ্রীয়গ্রাহ্যও ছিলো।

হুযূর-ই আক্‌রাম 'নূর হওয়া'র পক্ষে আরো অনেক দলীল-উপস্থাপন করা যায়; কিন্তু আমি এতটুকু উল্লেখ করে ক্ষান্ত হলাম। যারা মেনে নেওয়ার মানসিকতা রাখে, তাদের জন্য এতটুকু যথেষ্ট। আর যারা জেদ করে, হঠকারিতা করে তাদের জন্য বিরাটাকার গ্রন্থও যথেষ্ট নয়।

যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি

আক্বল বা বিবেকও একথা দাবী করে যে, 'হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খোদ্ মহান রবের নূর। তাঁর প্রতিটি অঙ্গ শরীফ নূর। তাঁর প্রতিটি অবস্থা শরীফ নূর। দলীলাদি নিম্নরূপ:

এক. 'নূর' হচ্ছে এমন আলো, যা নিজেও প্রকাশ্য, অপরকেও প্রকাশ করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজে তো এমনই প্রকাশ্য যে, তাঁকে জল ও স্থল, শুকনো ও ভেজা, গাছপালা ও পাথর, আসমানের প্রতিটি তারা, যমীনের প্রতিটি কণা চিনে। মানব জাতি তাঁকে জানে, জীবজন্তু ও পশু তাঁকে চিনে ও মানে, কঙ্কর তাঁর কলেমা পড়ে, পাথর তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। মোটকথা, স্বয়ং এমন চমকিত যে, কারো থেকে গোপন নন। আর অন্যান্য সৃষ্টিকেও এমনভাবে চমকিয়ে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি বা বস্তুর সম্পর্ক তাঁর সাথে হয়ে গেছে, সেও চমকে গেছে। মদীনা মুনাওয়ারার গলিগুলো হুযূর-ই আক্‌রামের মাধ্যমে চমকিত হয়েছে, মক্কা মুকার্‌রামার অলিগলি ও বাজারগুলো, কা'বা-ই মু'আয্‌যামার দেওয়াল ও দরজাগুলো নয়নাভিরাম নক্‌শা ও কারুকার্য দ্বারা চমকে উঠেছে। তাঁরই কারণে দুনিয়া হযরত হালীমা ধাত্রীর মহত্ত্বের গীত গাচ্ছে। তাঁরই বরকতে তাঁর বংশের বুযুর্গীর খোৎবা পড়া হচ্ছে। এমনকি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরের মধ্যে যাঁদেরকে হুযূর-ই আক্‌রাম প্রকাশ করেছেন, তাঁরাই তো প্রকাশ পেয়েছেন, বাকীরা সবাই গুপ্ত হয়ে গেছেন; বরং স্বয়ং খোদা তা'আলার যাত ও সিফাত (সত্তা ও গুণাবলী) আমরা হুযূর-ই আক্‌রামের মাধ্যমেই চিনেছি। আমাদের বিবেকগুলো ওই

পর্যন্ত পৌঁছানো অসম্ভব ছিলো। মোটকথা, নূরের মর্মার্থ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে মওজুদ রয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পূর্ণাঙ্গ নূরই।

দুই. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দো'আগুলো নিশ্চিতভাবে কবূল। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى (তরজমা: এবং অবিলম্বে আপনার রব আপনাকে এতবেশী দেবেন যে, আপনি রাজি (সন্তুষ্ট) হয়ে যাবেন। ৯৩:৩) আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও এ দো'আ করতেন-اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ نُوْرًا(হে আল্লাহ্! আমাকে নূর করে দাও।) বলুন, এ দো'আ কবূল হয়েছে কিনা? অবশ্যই হয়েছে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে হুযূর-ই আক্রাম নূর হয়ে গেছেন।

তিন. মানুষের দেহ 'খাকী' বা মাটির তৈরী আর রূহ হচ্ছে 'নূরী' বা নূরের তৈরী। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ (আপনি বলে দিন, রূহ মহান রবের 'নিদের্শেই সৃষ্ট।') অর্থাৎ রূহ 'আমর' বা নির্দেশ জগতের একটি সৃষ্টি। নিশ্চয় 'আলমে আমর' (নির্দেশ জগত) হচ্ছে নূর। আল্লাহর দরবারে মাক্ববূল বান্দাদের 'নূরানিয়াত' (নূর হওয়া) এত বেশী বেড়ে যায় যে, দেহ পর্যন্ত নূর হয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহ্‌র কোন কোন ওলীর দেহে কখনো কখনো তলোয়ারের আঘাতও প্রভাব ফেলেনি; তলোয়ার এদিক থেকে ওদিকে পার হয়ে গেছে। (তাঁর দেহ কাটেনি।) কিছু সংখ্যক ওলী কয়েকমাস যাবৎ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেননি; কিন্তু তাঁদের দেহে কোন পরিবর্তন আসেনি। 'ফাতাওয়া-ই হাদীসিয়াহ্: বাবুত্ তাসাওফ'-এ আল্লামা ইবনে হাজর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয সম্পর্কে বলেছেন-

حَتّٰى اَنَّهٗ مَكَثَ ثَلٰثَةَ اَشْهُرٍ عَلٰى وُضُوْءٍ وَاحِدٍ

অর্থ: তিনি এক ওযূর উপর দীর্ঘ তিন মাস যাবৎ রয়ে গেছেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ বরকতময় দলের সরদার ও পেশ্ওয়া। হুযূর-ই আক্রামের নূর 'রূহানী' (আত্মিক)। তা 'দৈহিক' দিকের উপর এমন বিজয়ী যে, তাঁর পবিত্রতম দেহও নূরী হয়ে গেছে।

চার. একাধিক রেওয়ায়ত থেকে একথা সাব্যস্ত হয় যে, হুযূর-ই আন্ওয়ারের পবিত্রতম দেহের ছায়া ছিলো না। যেমন এ পুস্তকের 'দ্বিতীয় অধ্যায়'-এ ইনশা-আল্লাহ্ আসবে। বস্তুত: জড় বস্তুর অবশ্যই ছায়া হয়। বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার নূর। ওই ধরনের জড়তা হুযূরের ধারে কাছেও নেই।

পাঁচ. হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে আগুনের বলয় ও যামরাহীর বা শীতলতার বলয় অতিক্রম করেছেন। অতঃপর

ওখানে পৌঁছেছেন, যেখানে 'মাকান' (স্থান)ও খতম হয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ তিনি 'লা-মাকানের মকীন' (যেখানে স্থানও নেই সেখানে অবস্থানকারী) হয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, সাধারণত দেহ আগুন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। তা মাকান বা স্থানেরও মুখাপেক্ষী। বুঝা গেলো যে, ওই রাতে নূরানিয়াতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো।

ছয়. কোন মানুষ বাতাস ব্যতীত বাঁচতে পারে না। আর মি'রাজ রাতে হুযূর-ই আক্রাম যেখানে তাশরীফ নিয়ে যান, সেখানে বাতাসের নাম-নিশানাও ছিলোনা। এতদ্সত্ত্বেও তিনি সেখানে জীবিত ছিলেন। এ থেকেও বুঝা যায় যে, হুযূর-ই আক্রাম নূর।

সাত. যদি মানুষের হৃদযন্ত্রের উপর সামান্যটুকু আঘাত বা ঠ্যাসও লেগে যায় তবে তার মৃত্যু হয়ে যায়; অথচ ফেরেশতাগণ হুযূর-ই আক্রামের হৃদয় মুবারককে নূরানী বক্ষ থেকে বের করেছিলেন। সেটাকে চিরে তাতে নূর ভর্তি করে দিয়েছেন। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও হুযূর-ই আক্রাম জীবিত রয়েছেন। বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আক্রাম নূর। আর তাঁর জীবদ্দশায় 'নূরানিয়াত'-ই রয়েছে।

আট. 'সওমে ভেসাল' (দিনে রাতে ইফতার বিহীন রোযা) হুযূর-ই আক্রাম নিয়মিতভাবে রেখেছেন। অর্থাৎ কয়েকদিন একাধারে এমনভাবে রোযা রেখেছেন যে, মধ্যখানে ইফতার মোটেই করেননি। এতদ্সত্ত্বেও ক্ষুধা-পিপাসার কোন প্রভাব তাঁর উপর পড়েনি। যদি তাঁর জীবন শরীফ আমাদের মতো একেবারে দৈহিক হতো, তবে পানাহারের এমন অমুখাপেক্ষী হতেন না। হুযূর-ই আক্রামের নূর এখনো কিছু সংখ্যক সম্মানিত ওলী রাতে ও দিনে এ চোখে দেখতে পাচ্ছেন। মাওলানা জামী আলায়হির রাহমাহ্ বলেছেন-

گرچہ صد مرحلہ دورم ز بر پیش نظرم - وَجْهُهٗ فِىْ نَظَرِىْ كُلَّ غَدَاةٍ وَعَشِىٍّ

অর্থ: যদিও আমি শত ক্রোশ দূরে অবস্থান করি, তবুও তিনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন। সকাল ও সন্ধ্যার প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর চেহারা আমার চোখের সামনে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার জনৈক ওলী বলেন, ''যদি আমি একটা মাত্র মুহূর্তের জন্য তাঁর নূরকে দেখতে না পাই, তখন আমি আমাকে মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাবার ফাত্ওয়া দিয়ে দেবো।'' (অর্থাৎ আমি নিশ্চিতভাবে সব সময় তা দেখতে পাই।)

অনেক জিনিষ এমন রয়েছে, যেগুলো আমরা দেখিনা; কিন্তু দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নদের থেকে শুনে আমরা তা মেনে নিই। যেমন, সূর্যকে যদি কোন অন্ধলোক না দেখে, তবে সেও সূর্য এবং সেটার আলোর কথা মেনে নেয়। আমাদেরও উচিৎ হচ্ছে- যদি হুযূর-ই আক্রামের নূর আমাদের

দুর্বলতার কারণে এ চোখে দেখতে না পারি, তাহলে কানে শুনে যেন মেনে নিই।

নয়. হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে হাজারো বছরের সফর একটা মাত্র মুহূর্তে অতিক্রম করেছেন। তাঁর এ দেহ মুবারক যদি নিছক জড়ই হতো, তবে তো এতদীর্ঘ সফর এত স্বল্প সময়ে অতিক্রম করতে পারতেন না। বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আক্‌রাম নূরই। আর যেমন চোখের আলো, অথবা আমাদের কল্পনার আলো মুহূর্তের মধ্যে দূর থেকে দূরতম গন্তব্যে একটা মাত্র মুহূর্তে পৌঁছে যায়, তেমনি হুযূর-ই আক্‌রাম এত দীর্ঘ দূরত্ব একটা অতি স্বল্প সময়ে অতিক্রম করেছেন।

দশ. ক্বোরআন-ই করীম হুযূর-ই আক্‌রামের প্রশংসায় এরশাদ করেছে- عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ(তোমাদের কষ্টে পড়া তার জন্য ভারী ও কষ্টকর। ৯:১২৮)
বুঝা গেলো যে, যেভাবে রূহ সেটার নূরানিয়াত (বা নূর হওয়া)-এর কারণে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি ব্যথা সম্পর্কে অবগত, যেমন পায়ে আঘাত লাগলে রূহ অনুভব করতে পারে, মাথায় ব্যথা হলে রূহ অবগত হয়, তেমনি হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামও নূর। আপন প্রতিটি উম্মতের প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

এগার. ক্বুদরতের কানূন বা নিয়ম হচ্ছে- 'অধিক'-এর সূচনা 'একক' থেকে হয়। 'অধিক' ফয়য পায় 'একক' থেকে। যেন এককই সমস্ত আধিক্যের ফয়যের উৎস। দেখুন আসমানের অগণিত তারকা একটি মাত্র সূর্য থেকে নূর অর্জন করে, গাছের সমস্ত পাতা, ডালপালা, ফুল ও ফল- এ সবের শুরু বা সূচনা একটি মাত্র শিখড় থেকে এবং সব ক'টিতে ফয়যও এ একমাত্র শিকড় থেকে সরবরাহ্ করা হয়। সমস্ত মানুষের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফয়য পায় এক মাত্র হৃদযন্ত্র থেকে। মোটকথা, প্রত্যেক আধিক্যের মধ্যে এককের ফয়য বিদ্যমান। সুতরাং উচিৎ হচ্ছে- আধিক্য-জগৎ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত যা কিছু রয়েছে তার সূচনাও 'এক থেকে হওয়া'। এ আধিক্যের মধ্যেও কোন এক ফয়য পৌঁছাচ্ছে। এ উৎস, ফয়য বিতরণকারী ও 'এক'-এর নাম হচ্ছে হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী এবং নূরে মুহাম্মদীই। অন্যথায় বলো এ সব আধিক্য কোন এককের শাখা-প্রশাখা? আর কোন একক এখানে কার্যকর। মোটকথা, একথা একেবারে অনুমান ও ক্বিয়াস-বান্ধব কথা যে, হাক্বীক্বতে মুহাম্মাদিয়াহ্ হচ্ছে গোটা বিশ্বের মূল। আর সারা বিশ্ব তাঁরই থেকে ফয়য গ্রহণ করে এবং গ্রহণ করতে থাকবে। (আল্লাহ্ তা'আলা হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী ও নূরে মুহাম্মদীকে এমনই উৎস করে সৃষ্টি করেছেন।)

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার বিপক্ষে আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন

আপত্তি-১

যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর হন, তাহলে তো তিনি খোদা তা'আলার নূরের টুকরা হয়ে গেলেন, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর অংশ হয়ে গেলেন। ফলে হুযূরের মধ্যে খোদাত্ব এসে গেলো! এ আক্বীদা খ্রিস্টানদের আক্বীদার মতো হয়ে গেলো। কারণ, তারা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যে খোদার অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করে।

খন্ডন

এসব ক'টি প্রশ্নের কারণ হচ্ছে-আপত্তিকারী বিষয়টি বুঝতে পারেনি। 'আল্লাহর নূর হওয়া'-এর অর্থ শুধু এ'যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি মহান রব থেকে ফয়য গ্রহণকারী। আর সমস্ত সৃষ্টি হুযূর-ই আক্‌রামের মাধ্যমে 'ফয়যে রব্বানী' (আল্লাহর ফয়য বা রহমত) অর্জন করেছে। যেমন আয়না সূর্যের সামনে হলে সূর্যের প্রতিবিম্ব ওই আয়নাকে চমকিয়ে দেয়। তারপর এ আয়নাকে অন্য হেজাব বিশিষ্ট আয়নাগুলোর সামনাসামনি করো। তখন দেখবে ওইসব আয়না এ আয়না দ্বারা চমকিত হয়ে ওঠে। তখন তো প্রথম আয়নাটা না সূর্যের টুকরো হলো, না মূল সূর্য হলো; বরং কোন মাধ্যম ছাড়া তা থেকে তাজাল্লী (আলো) অর্জন করেছে মাত্র। আর অন্যান্য আয়না এর মাধ্যমে (আলো হাসিল করেছে)। এর সম্পর্ক তেমনি, যেমন ক্বোরআন-ই করীম হযরত সালিহ্ আলায়হিস সালামের উট্‌নীকে 'নাক্বাতুল্লাহ্' (نَاقَةُ اللهِ অর্থাৎ 'আল্লাহর উট্‌নী' বলেছে আর হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে رُوْحٌ مِّنْهُ (তাঁর তরফ থেকে নূর) বলেছে। অর্থাৎ পিতামাতার মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট। (সুতরাং আর কোন আপত্তি রইলো না।)

আপত্তি-২

হুযূর-ই করীম নূর নন; কারণ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

[(হে হাবীব, আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আমি তোমাদের মতো 'বশর' (মানুষ)]

[১৮:১১০]

যখন হুযূর বশরই, তখন তিনি নূর নন। বশরিয়াত ও নূরিয়াত (মানুষ ও নূর হওয়া) একত্রিত হতে পারে না।

খন্ডন

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূরও, বশরও। অর্থাৎ নূরী বশর। হুযূর-ই আক্‌রামের 'হাক্বীক্বত' হচ্ছে নূরের, আর লেবাস (বাহ্যিক রূপ) হচ্ছে বশরী (মানবীয়)। মহান রব হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে বলেছেন-

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

তরজমা: তারপর তার প্রতি আমি আপন 'রূহানী' প্রেরণ করেছি, সে তার সামনে একজন সুস্থ মানুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

[(১৯:১৭) কানযুল ঈমান]

হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম ফেরেশতা। ফেরেশতা নূর। তিনি হযরত মরিয়মের নিকট 'বশরী' আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ওই সময় এ বশরী আকৃতির কারণে তিনি তাঁর নূরানিয়াত থেকে পৃথক হয়ে যাননি। সাহাবা-ই কেরাম হযরত জিব্রাঈলকে মানুষের আকারে দেখেছেন। তখন তাঁর মাথার চুল (যুলফি) ছিলো গাঢ় কালো, লেবাস (পোষাক) ছিলো ধবধবে সাদা। চোখ, নাক ও কান সবই তাঁর শরীরে বিদ্যমান ছিলো। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি নূরই ছিলেন। অনুরূপ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত লূত্ব ও হযরত দাঊদ আলায়হিমুস্ সালাম-এর দরবারে ফেরেশতাগণ মানুষের আকৃতিতে গিয়েছেন। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

এক.

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ O اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ O

তরজমা: হে মাহবূব, আপনার নিকট কি ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথির সংবাদ এসেছে? যখন তারা তার নিকট এসে বললো, 'সালাম'। সেও বললো, 'সালাম'। অপরিচিতের মতো লোকগুলো। [৫১:২৪-২৫, কান্‌যুল ঈমান]

দুই. আরো এরশাদ হয়েছে-

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ O اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ...الاية

তরজমা: এবং আপনার নিকট কি ওই অভিযোগকারীদের খবরও পৌঁছেছে, যখন তারা দেয়াল ডিঙ্গিয়ে দাঊদের মসজিদে এসেছিলো? যখন তারা দাঊদের নিকট প্রবেশ করলো, তখন সে তাদের কারণে ভীত হয়ে পড়লো, তারা আরয করলো, 'ভয় করবেন না, আমরা দু'টি দল, আমাদের একে অপরের প্রতি যুল্‌ম করেছে। [...আল-আয়াত, ৩৮:২১-২২, কান্‌যুল ইমান]

তিন. আরো এরশাদ হয়েছে-

وَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ O

তরজমা: এবং যখন আমার ফেরেশতাগণ লূত্বের নিকট আসলো, তখন তাদের আগমন তাঁর নিকট বিস্বাদ অনুভূত হলো এবং তাদের কারণে তাঁর অন্তর সংকুচিত হলো। আর তারা বললো, 'ভয় করবেন না এবং দুঃখও করবেন না। নিশ্চয় আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবো; কিন্তু আপনার স্ত্রীকে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

[২৯:৩৩, কান্‌যুল ঈমান]

এ সব ক'টি আয়াত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাগণ সম্মানিত নবীগণের দরবারে মানুষের আকৃতি (বশরী সূরতে) হাযির হতেন, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা নূরও থেকে যান। মোটকথা 'নূরানিয়াত' ও 'বশরিয়াত' পরস্পর বিরোধী নয়।

আপত্তি-৩

যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূর হন এবং প্রতিটি স্থানে 'হাযির-নাযির' হন, তাহলে উচিৎ হবে কোন স্থানেই অন্ধকার না থাকা, প্রতিটি স্থানে আলো থাকা। সুতরাং হয়তো হুযূর নূর নন; অথবা তিনি প্রতিটি স্থানে হাযির-নাযির নন।

খন্ডন

এ আপত্তির দু'টি জবাব দেওয়া যায়- একটি আপত্তিকারীর আপত্তি থেকে (الزامى), অপরটি গবেষণা ভিত্তিক (تحقيقى)।

প্রথমোক্তটি এযে, মহান রবও তো নূর। তিনি (তাঁর ইল্‌ম ও ক্বুদরত) আমাদের সাথে আছেন। কিন্তু প্রতিটি স্থানে তো আলো থাকছে না। এরশাদ হচ্ছে-

এক. اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তরজমা: আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনের নূর। [২৪:৩৫, কানযুল ঈমান]

দুই. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

তরজমা: ওই রব তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।

[৫৭:৪, কানযুল ঈমান]

তিন. نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ

তরজমা: আমি তার অধিক নিকটে থাকি তোমাদের চেয়েও, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা। [৫৬: ৮৫, কান্‌যুল ঈমান]

চার. نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

তরজমা: এবং আমি হৃদয়ের শিরা অপেক্ষাও তার অধিক নিকটে আছি।

[৫০:১৬, কান্‌যুল ঈমান]

পাঁচ. اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

তরজমা: নিশ্চয় আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন। [২: ১৫৩, কানযুল ঈমান]

তাছাড়া, ক্বোরআন শরীফ নূর, প্রায় প্রতিটি ঘরে রয়েছে; কিন্তু আলো তো হয় না। ফেরেশতাগণ নূর, আমাদের সাথে থাকেন। কিন্তু তাঁদের আলো পড়ে না।

ছয়. আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

তরজমা: আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলো (ক্বোরআন) অবতীর্ণ করেছি।

[৪: ১৭৫, কানযুল ঈমান]

সাত.

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ...الاية

তরজমা: আপনি বলুন, তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করে মৃত্যুর ফেরেশতা, যে তোমাদের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। অতঃপর আপন প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবে। [৩২: ১১, কানযুল ঈমান]

হে আপত্তি কারীরা! এখন কি বলবে যে, হয়তো মহান রব আমাদের সাথে নেই, নতুবা তিনি নূর নন? অনুরূপ, হয়তো ফেরেশতা ও ক্বোরআন আমাদের নিকট নেই, নতুবা নূর নয়?

দ্বিতীয় (গবেষণাধর্মী) জবাব

নূর দু'প্রকারের, ১. نور حِسِّىْ (ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নূর) ও نور معنوى (বিবেকগ্রাহ্য নূর)। 'নূর-ই হিস্সী' (ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য) নূরের জন্য তা ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য হওয়া জরুরী। কিন্তু 'নূরে মা'নাভী' (শেষোক্ত নূর) দেখার জন্য ক্বুদসী-ক্ষমতা সম্পন্ন চোখের দরকার। যদি অন্ধ সূর্যকে না দেখে, তাহলে তার উচিত হবে- যাঁরা দেখেন তাদের থেকে শুনে সেটাকে নূর বলে মেনে নেওয়া। অনুরূপ ক্বুদ্সী ক্ষমতা সম্পন্ন, আল্লাহর ওলীগণ 'নূরে মুহাম্মদী' দেখতে পান, অনুভব করেন। তাঁদের নিকট থেকে শুনে, ক্বোরআনকে মেনে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'নূর' বলে মেনে নেওয়াই অপরিহার্য।

আপত্তি-৪.

যদি হুযূর-ই আক্রাম নূর হন, তবে তিনি পানাহার কেন করতেন? তাঁর সন্তান-সন্ততি কেন হয়েছেন? সুতরাং সমস্ত সাইয়্যেদও নূর হওয়া চাই। কারণ মানুষের সন্তান মানুষ, ঘোড়ার বাচ্চা ঘোড়া, বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়। সুতরাং নূরের সন্তান নূরই হওয়া চাই। (আপত্তিকারী হচ্ছে-ওহাবী)

খন্ডন

কোন আয়াত কিংবা হাদীসে একথা নেই যে, নূরের আওলাদ (সন্তান) হয় না; যদি থাকে পেশ করো। ফেরেশতাদের আওলাদ না হওয়া এ জন্য যে, তারা ফেরেশতা, ফেরেশতাদের আওলাদ নেই। আমরা হুযূর-ই আক্রামকে নূর বলে বিশ্বাস করি; ফেরেশতা বলিনা। তোমাদের এ অনর্থক কথাবার্তা নিছক অকেজো। এসব প্রশ্ন ওই অবস্থায় হতে পারে, যখন হুযূর-ই আক্রামের 'বশরিয়াত' (মানব হওয়ার বৈশিষ্ট্য)-কে অস্বীকার করা হয়। হুযূর-ই আক্রাম নূরও, বশরও। আর তোমাদের বর্ণিত এসব অবস্থা তো বশরিয়াতেরই; নূরানিয়াতের নয়। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম হাজারো বছর ধরে আসমানে রয়েছেন। তিনি সেখানে পানাহার, শয়ন ও আওলাদ ইত্যাদি থেকে পবিত্র। কারণ, সেখানে নূরানিয়াতেরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে। তিনি যখন দুনিয়ায় আসবেন, তখন পানাহার, বিয়ে শাদী সব কিছু করবেন। তখন বশরিয়াতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে হাজারো বছরের সফর অতিক্রম করেছেন। তখন নূরানিয়াতের বহিঃপ্রকাশ ছিলো; পানাহারের প্রয়োজন হয়নি। যখন হুযূর-ই আন্ওয়ার 'সওম-ই ভেসাল' (ইফতার-সেহেরী বিহীন একটানা অনেক দিন রোযা) রাখতেন তখন তো একটানা এতদিনের রোযা ইফতার ছাড়াই রাখতেন আর ক্ষুধা-পিপাসা মোটেই অনুভব করতেন না। কিন্তু অন্যান্য অবস্থায় যখন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতেন না, তখন ক্ষুধার চিহ্নাদি প্রকাশ পেতো। ওই রোযার অবস্থায় নূরানিয়াতের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো, আর অন্যান্য সময়ে বশরিয়াতের ঝলক বিচ্ছুরিত হতো।

হারূত ও মারূত দু'জন ফেরেশতা। তাঁরা নূর। কিন্তু যখন তাঁদেরকে দুনিয়ায় এ 'বশরী লেবাস' (মানবীয় আবরণ) পরিয়ে প্রেরণ করা হলো, তখন তো তাঁরা পানাহারও করতেন, বরং স্ত্রী সঙ্গমও করতে পারতেন। ওই পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের ক্ষমতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁদের উপর তিরস্কারসূচক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁদের এ পানাহার এবং স্ত্রী সঙ্গমের ক্ষমতা ওই মানবীয় আবরণের (লেবাসে বশরীর)ই বিধানাবলী ছিলো।

হযরত মালাকুল মওত হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর নিকট বশরী সূরত (মানুষের আকার)-এ এসেছিলেন। তখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর চপেটাঘাতে তাঁর চোখ দু'টি স্থানচ্যুত ও আলোহীন হয়েছিলো। এ চোখ দৃষ্টিহীন হওয়া বশরিয়াতের বিধান ছিলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর লাঠি যখন সাপ হয়ে যেতো, তখন সেটা পানাহারও করতো, সেটার এ পানাহার করা সেটার ওই আকৃতিরই বিধান ছিলো।

এক. মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ

তরজমা: এবং আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম, 'তুমি আপন লাঠি নিক্ষেপ করো।' সুতরাং তৎক্ষনাৎ তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো। [সূরা আ'রাফ: আয়াত-১১৭, কান্‌যুল ঈমান]

দুই. আরো এরশাদ করেন-

وَاَلْقِ مَافِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ط

তরজমা: এবং নিক্ষেপ করো যা তোমার ডান হাতে রয়েছে, তা তাদের কৃত্রিম বস্তুগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। [সূরা ত্বোয়াহা: আয়াত-৬০, কান্‌যুল ঈমান]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বশরিয়াত'-এর মধ্যে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর শাখা এবং তাঁর বংশধর। আর 'নূরানিয়াত'-এ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর 'আসল' (মূল)। 'নূর'-এ সন্তান জন্ম দেওয়া ও বংশ বিস্তার নেই। ঈমান নূর, ইল্‌ম নূর, মু'মিন (ঈমানদার) নূরানী, আলিম নূরানী, নুবূয়ত নূর, নবী নূরানী। এতদ্‌সত্ত্বেও মু'মিনের আওলাদ কাফিরও হয়। আলিমের সন্তান 'মুর্খ'ও হয়। এমনকি নবীর সন্তান কাফিরও হয়ে যায়। জান্নাতী লোকেরা নূরানী হবেন। হুরেরা নূর। কিন্তু হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন জান্নাতী আওলাদের আকাঙ্ক্ষা করবে। আর তাদের সন্তান হবে। বলুন, যদি নূরের আওলাদ হতে না পারে, তাহলে এসব জান্নাতী লোকের আওলাদ কীভাবে হবে?

আপত্তি-৫

قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

(নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং উজ্জ্বলকারী কিতাব)। এর واو (অব্যয় পদটা) عطف تفسيرى বা পূর্ববর্তী বাক্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত। আর 'নূর' দ্বারা 'ক্বোরআন শরীফ' বুঝায়; নবী করীম বুঝায় না; যাকে 'আলোকিতকারী' কিতাব (কিতাবে মুবীন) বলছে।

খন্ডন

মুহাক্বিক্বিক্ব (গবেষক) তাফসীরকারকগণের মতে, 'নূর'- মানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। যেমন ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী, তাফসীর-ই খাযিন, মাদারিক, তাফসীর-ই ইবনে আব্বাস, তাফসীর-ই সাভী ইত্যাদি। অনুরূপ, এ আয়াতের শুরুতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় উল্লেখ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

يَآ اَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ط قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ O

তরজমা: হে কিতাবীরা, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার এ রসূল তাশরীফ এনেছেন, যিনি তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেন ওইসব বস্তু থেকে এমন অনেক কিছু, যেগুলো তোমরা কিতাব থেকে গোপন করে ফেলেছিলে এবং অনেক কিছু ক্ষমা করে থাকেন। নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব। [সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত-১৫, কান্‌যুল ঈমান]

উপরোল্লিখিত আয়াত শরীফ বলছে যে, 'নূর' মানে ওই রসূল, যাঁর উল্লেখ এসেছে। তাছাড়া, واو কে عطف تفسيرى মানা যেন রূপক অর্থ বুঝানো; অথচ বিনা কারণে 'রূপক অর্থ' গ্রহণ করা উচিৎ নয়। কেননা عطف - معطوف ও معطوف عليه - এর মধ্যে পরস্পর ভিন্নতা চায়। সুতরাং উচিৎ হচ্ছে 'নূর' একটি হোক আর 'কিতাব' হোক অন্য কিছু। তাছাড়া, عطف تفسيرى-এর মধ্যে 'কিতাব-ই মুবীন' تجديد বা নতুন কিছুর বর্ণনা রয়েছে, আর প্রথমোক্ত অবস্থায় 'কিতাব-ই মুবীন'-এ تأسيس (বুনিয়াদী বিষয়ের বর্ণনা) রয়েছে। বস্তুত: تجديد থেকে تأسيسঅধিকতর উত্তম। অর্থাৎ উত্তম হচ্ছে দ্বিতীয় ইবারত নতুন করে কিছু বলুক; এ নয় যে, প্রথমোক্ত (পূর্বোল্লিখিত) কথাকে পুনর্বার বলে দিক।

তাছাড়া, আলোচ্য আয়াতের তাফসীর হচ্ছে এ-ই আয়াত-

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

তরজমা: হে অদৃশ্যের সংবাদাতা (নবী), নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি 'উপস্থিত- পর্যবেক্ষণকারী' (হাযির-নাযির) করে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে; এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে। [সূরা আহযাব: আয়াত-৪৫-৪৬, কান্‌যুল ঈমান]

এ আয়াত সুস্পষ্টভাষায় হুযূর-ই আন্‌ওয়ারকে নূরানী সূর্য বলেছে। আর খোদ্ ক্বোরআনের তাফসীর অন্য তাফসীর থেকে উচুঁতর। তাছাড়া, এ আয়াতের তাফসীর হচ্ছে ওই হাদীস শরীফ থেকে, যাকে মৌলভী আশরাফ আলী সাহেব তার কিতাব 'নশরুত্ব ত্বী-ব' (نشر الطيب)-এ ইমাম আবদুর রায্‌যাক্বের বরাতে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে উদ্ধৃত করেছেন-

يَاجَابِرُ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَآءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ

অর্থাৎ হে জাবির, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূরকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।

আর ক্বোরআনের তাফসীর, 'যা স্বয়ং ক্বোরআনের ধারক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম করেছেন, তা হচ্ছে উচ্চতর পর্যায়ের কিতাব। তাছাড়া, কিতাবের জন্য 'নূর' (আলো) থাকা জরুরী, যাতে তা পাঠ করা যেতে পারে। ক্বোরআনের ইবারত (বা বচনগুলো) পড়ার জন্য যেমন প্রকাশ্য আলোর দরকার, তেমনি ক্বোরআনের গূঢ় রহস্যাদি বুঝার জন্য রূহানী নূরের দরকার। আর ওই নূর হলেন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

আপত্তি-৬

ক্বোরআন-ই করীম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খোদ্ ক্বোরআন হচ্ছে 'তায্কিরাহ্' অর্থাৎ নসীহত অথবা পূর্ব ও পরবর্তী বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দেয় এমন। ক্বোরআন হচ্ছে নূর, ক্বোরআন হচ্ছে হিদায়ত, ক্বোরআন হচ্ছে 'বোরহান', ক্বোরআন হলো শেফা, ক্বোরআন হচ্ছে রহমত। যখন ক্বোরআনে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তখন অন্য কোন নূর কিংবা অন্য কোন হিদায়তের প্রয়োজন নেই, পবিত্র ক্বোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলো দেখুন-

এক. اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا

তরজমা: নিশ্চয় এটা উপদেশ, সুতরাং যার ইচ্ছা হয় সে যেন আপন প্রতিপালকের দিকে রাস্তা গ্রহণ করে। [সূরা মুয্যাম্মিল: আয়াত-১৯]

দুই. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

তরজমা: এবং আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নূর নাযিল করেছি।

[সূরা নিসা: আয়াত-১৭৪]

তিন. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙO

তরজমা: সে-ই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব (ক্বোরআন) কোন সন্দেহের ক্ষেত্র নয়। তাতে হিদায়ত রয়েছে খোদাভীতি সম্পন্নদের জন্য।

[সূরা বাক্বারা: আয়াত-২]

চার. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

তরজমা: আমি ক্বোরআনের ওই সব আয়াত নাযিল করেছি, যেগুলো শেফা (আরোগ্য) এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। [সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত-৮২]

পাঁচ. قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

তরজমা: নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিকট থেকে অকাট্য দলীল এসেছে। [সূরা নিসা: আয়াত-১৭৫]

আপত্তি-৭

যেহেতু এসব ক'টি গুণ বা বৈশিষ্ট্য ক্বোরআন থেকে অর্জন করা হয়েছে, সেহেতু অন্য 'নূর' আসা অর্জিত বস্তু পুনরায় অর্জনের নামান্তর (تحصيل حاصل)। এটা অসম্ভব। সুতরাং নবীর মধ্যে এসব গুণের কোনটা আছে বলে মানা যায় না।

উভয় আপত্তির খন্ডন

যেহেতু ক্বোরআন সর্বশেষ কিতাব এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য অবতীর্ণ ও সব সময়ের জন্য এসেছে, সেহেতু এতে এসব ক'টি গুণ মওজূদ রয়েছে। যেমন-এটা অলস ও উদাসীনদের জন্য স্মরণ করিয়ে দেয় এমন, বিবেকবানদের জন্য আলো, পথভ্রষ্টদের জন্য হিদায়ত (পথ নির্দেশক), দৈহিক কিংবা আত্মিক রোগীদের জন্য শেফা, মু'মিনদের জন্য রহমত এবং গবেষকদের জন্য অকাট্য দলীল। অনুরূপ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আখেরী নবী এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ও সব সময়ের জন্য। সুতরাং তাঁর মধ্যেও সমস্ত গুণ থাকা চাই, যাতে প্রত্যেক ধরনের সৃষ্টি হুযূর-ই আক্রাম থেকে ফয়য অর্জন করতে পারে। এ কারণে মহান রব হুযূর-ই আক্রামের ওইসব গুণ বর্ণনা করেছেন, যেগুলো ক্বোরআন-ই করীম বর্ণনা করেছে। সুতরাং হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন مُنَكِّرٌ অর্থাৎ নসীহতকারী অথবা পূর্ব ও পরবর্তী সবকথা স্মরণ করিয়ে দেয় এমন।
হুযূর-ই আক্রাম 'বোরহান' বা অকাট্য দলীলও, হুযূর শেফাও, হুযূর-ই আক্রাম রহমতও। এ আয়াতগুলো দেখুন-

এক. فَذَكِّرْ ۗ قف اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ

তরজমা: সুতরাং আপনি উপদেশ শোনান; বস্তুত: আপনি উপদেশদাতাই;

[সূরা গাশিয়াহ: আয়াত-২১, কান্যুল ঈমান]

দুই. اِنَّكَ لَتَهْدِىْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

তরজমা: নিশ্চয় আপনি সোজা পথের হিদায়ত করছেন। [সূরা শু'আরা: আয়াত-৫২]

তিন.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

তরজমা: হে মানবকুল, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি এক উজ্জ্বল আলো অবতীর্ণ করেছি।

[সূরা নিসা: আয়াত-১৭৫, কান্যুল ঈমান]

চার. وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

তরজমা: এবং আমি আপনাকে সমস্ত বিশ্বজগতের জন্য রহমত করেই প্রেরণ করেছি। [সূরা আম্বিয়া: আয়াত-১৭, কান্যুল ঈমান]

মোটকথা, না ক্বোরআনের গুণাবলীর সীমা আছে, না ক্বোরআনের ধারকের গুণাবলীর শেষ আছে; বরং কা'বা হচ্ছে শরীরগুলোর ক্বেবলা, আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন হৃদয়, ঈমান ও প্রাণের ক্বেবলা।

এতে 'অর্জিতের অর্জন' (تحصيل حاصل) অনিবার্য হয় না। কেননা, আমরা দুনিয়ায় এ উভয়ের মুখাপেক্ষীঃ ১. চোখের আলো এবং ২. সূর্য কিংবা চেরাগের আলো। যদি চোখ জ্যোর্তিময় হয়; কিন্তু চেরাগ ইত্যাদির আলো না থাকে, তবুও দৃষ্টিগোচর হবে না; দেখা যায় না। আর যদি চেরাগ ইত্যাদির আলো থাকে; কিন্তু চোখে জ্যোতি না থাকে, তবুও কিছু দেখা যায়না। অনুরূপ, ক্বোরআন যেন চেরাগ অথবা সূর্য আর ক্বোরআনের ধারক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেন দৃষ্টির আলো। অথবা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন সূর্য ও চাঁদ, তখন ক্বোরআন-ই করীম হলো দৃষ্টির আলো। মোটকথা, আমাদের 'নূর-ই ক্বোরআনের'ও দরকার, 'নূর-ই নুবূয়তের'ও। নামায ক্বোরআন থেকে পেয়েছি, কিন্তু নামাযের সংখ্যা, রাক্'আতগুলোর পরিমাণ, নামাযের নিয়মাবলী হুযূর-ই আক্রাম থেকে অর্জিত হয়েছে। এভাবে, যাকাত ও হজ্ব ইত্যাদি ক্বোরআনই দিয়েছে, কিন্তু সেগুলো আদায় করার নিয়মাবলী হুযূর-ই আক্রামই শিক্ষা দিয়েছেন। না তাতে 'অর্জিতের অর্জন' (تحصيل حاصل) আছে, না অন্য কোন মন্দ দিক; বরং 'নূরে নুবূয়ত' 'নূরে ক্বোরআনী'র পূর্বে প্রয়োজন। এজন্য কাফিরকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করা হয়, ক্বোরআন পড়িয়ে নয়। নবজাত শিশুর কানে আযান বলা হয়, ক্বোরআন পড়া হয় না।

আপত্তি-৮

হাদীস শরীফে আছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দো'আ করতেন- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا আর শেষভাগে বলতেন- وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا (অর্থাৎ হে আল্লাহ্, আমার চোখে, কানে, গোশতের মধ্যে ও অস্থিতে নূর দান করো। আর আমাকে নূর করে দাও।) যদি হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং পূর্ব থেকে নূর হতেন, তাহলে এ দো'আর প্রয়োজন কি ছিলো? নূর তো তাকেই বানানো হয়, যে আগে থেকে নূর নয়।

খন্ডন

এর দু'টি জবাব দেয়া যেতে পারে- ১. আপত্তিকারীর কথার ভিত্তিতে (الزامى) এবং ২. গবেষণাভিত্তিক (تحقيقى)।

এক. প্রথমোক্ত জবাব হচ্ছে- আপনারাও তো সব সময় দো'আ করেন-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

(হে আল্লাহ! আমাদেরকে সোজা পথে চালাও! [সূরা ফাতিহা: আয়াত-৫, কান্যুল ঈমান]

আপনারা কি ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট ছিলেন? যখন আপনারা পূর্ব থেকে হিদায়তের উপর থাকেন, তাহলে আবার হিদায়ত কেন চাচ্ছেন? মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

১. هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

তরজমা: এ ক্বোরআন পরহেযগারদেরকে হিদায়তদাতা। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-২]

২. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا

তরজমা: হে ঈমানদারগণ তোমরা ঈমান আনো! [সূরা নিসা: আয়াত-১৩৬]

বলুন, যে সব লোক পূর্বেই পরহেযগার হয়ে গেছে তাদেরকে হিদায়ত দেওয়ার অর্থ কি? আর যারা পূর্বে ঈমান এনেছে, তাদেরকে ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়ার অর্থ কি?

দুই. গবেষণাধর্মী জবাব হচ্ছে- হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ দো'আ করা- 'হে খোদা, আমার চোখ ও কান ইত্যাদিকে নূর করে দাও' উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই। এটা নূরানিয়াতের উপর ক্বায়েম থাকার জন্য দো'আ করা।

আপত্তি-৯

হুযূর আলায়হিস্ সালামকে নূর বলা তাঁর প্রতি অশালীনতা প্রদর্শনের সামিল; হুযূর-ই আক্রামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে রয়েছে- তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি বলা। কেননা, মাটি নূর অপেক্ষা উত্তম। কারণ, ফেরেশতাগণ 'নূর' আর হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হলেন 'খাকী বশর' (মাটির তৈরী মানুষ)। ফেরেশতাগণ হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সাজদা করেছেন; হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ফেরেশতাদেরকে সাজদা করেননি। কাজেই, হুযূরকে নূর বলে বিশ্বাস করা যেন তাঁর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা। নূর হচ্ছে সাজদাকারী (ساجد) আর মাটি হচ্ছে সাজদাকৃত (مسجود)।

খন্ডন

এ আপত্তিরও দু'টি জবাব দেওয়া যায়- একটা তাদের কথার ভিত্তিতে (الزامى) আর অপরটা গবেষণাধর্মী (تحقيقى)। **প্রথমোক্তটা** হচ্ছে এ যে, তখনতো আল্লাহ্ তা'আলাকে নূর বললেও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং ক্বোরআনকে নূর বলা হলে ক্বোরআনের প্রতি বে-আদবী হবে। আশ্চার্য! হুযূর-ই আক্রামকে 'নূর' বললে, তাদের ভাষায় হুযূর-ই আক্রামের প্রতি বে-আদবী হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলাকে নূর বললে, তাদের মতে, এসব বে-আদবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়! মা-শা-আল্লাহ্, দেওবন্দী ওহাবীও আদব সম্পন্ন হয়ে গেলো! যারা হুযূর-ই আন্ওয়ার

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এমন এমন প্রকাশ্য বে-আদবী করেছে, যেগুলো প্রকাশ্য কাফিরও করতে পারেনি!

আর **শেষোক্ত জবাব** হচ্ছে- হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে ফেরেশতাগণ শুধু তাঁর মাটির দেহ মুবারককে সাজদা করেননি; বরং ওই নূরানী রূহকে করেছিলেন, যা ওই দেহ শরীফে ফুৎকার করা হয়েছিলো। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ

তরজমা: অতঃপর আমি যখন তাকে ঠিক করে নিই এবং সেটার মধ্যে আমার নিকট থেকে বিশেষ সম্মানিত রূহ ফুৎকার করে দিই, 'তখন সেটার নিমিত্তে তোমরা সাজদাবনত হয়ে পড়ো!' [১৫:২৯, কান্‌যুল ঈমান]

বুঝা গেলো যে, সাজদা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর রূহকে করা হয়েছিলো। যেহেতু দেহ শরীফ ওই রূহের প্রকাশস্থল হয়ে গিয়েছিলো, সেহেতু সাজদা সেটাকেও করা হয়েছিলো। আর হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের রূহ হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফার নূরের একটা ঝলক ছিলো। অন্যথায় হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর দেহ শরীফ তো রূহ ফুৎকারের চল্লিশ বছর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। যদি শুধু শরীর হতো, তাহলে তখন পর্যন্ত অপেক্ষা করা হতো না, এর পূর্বে সাজদা করিয়ে নেওয়া হতো, তাছাড়া, ইবলীস মাটির উপর মাটিতে মাটির দিকে সাজদা করার ক্ষেত্রে কখনো ওযর-আপত্তি করতো না। কারণ, সে ইতোপূর্বে মাটির কণাগুলোর উপর সাজদা করেছিলো। আজকে এ একটা সাজদাও সে করে নিতো। এখন যে সাজদা করতে সে অস্বীকার করছে, তা প্রকৃতপক্ষে ওই নূরানিয়াতকে অস্বীকার করছে, যা সাজদার কারণ। তদুপরি, যদি শুধু মাটিকেই মাটি দ্বারা সাজদা করানো উদ্দেশ্য হতো, তাহলে মাটির স্তুপ ও টিলা তো হাজারো মওজুদ ছিলো। ওইগুলো থেকে কোন একটার দিকে সাজদা করিয়ে নেওয়া হতো। বুঝা গেলো যে, মাটিকে সাজদা করানো হয়নি; বরং ওই নূরকেই সাজদা করানো হয়েছিলো, যা হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের মধ্যে আমানত (গচ্ছিত) রাখা হয়েছিলো। পংক্তি-

ریاں حال سے کہتے تھے آدم-جسے سجدہ ہوا ہے میں نہیں ہوں

অর্থ: অবস্থার ভাষায় হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বলছিলেন, যাঁকে সাজদা করা হয়েছিলো, তিনি তো আমি নই।

আপত্তি-১০

যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূর হন, তাহলে তিনি হযরত আদমের সন্তান হলেন কিভাবে? নূর কারো সন্তান হয় না। হুযূর-ই আক্‌রামকে 'আদমী' (মানুষ) বলা হয়। অর্থাৎ 'আদমের সন্তান' (আদম সংক্রান্ত)।

খন্ডন

আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বশরও, নূরও। অর্থাৎ নূরানী বশর। যাহেরী (প্রকাশ্য) শরীর মুবারক বশর, আর হাক্বীক্বত (বাস্তবে) নূর। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তান হওয়া এ বশরী দেহের গুণ বা বৈশিষ্ট্য; কিন্তু হাক্বীক্বত অনুসারে হুযূর সমগ্র বিশ্বের মূল এবং সমগ্র বিশ্ব হুযুর-ই আক্‌রাম থেকে সৃষ্ট। মহামহিম রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

এক.

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ O

তরজমা: হে হাবীব! আপনি বলুন, 'নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার ক্বোরবানী, আমার জীবন এবং মরণ- সবই আল্লাহর জন্য, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের। তাঁর কোন শরীক নেই; আমার প্রতি এটাই হুকুম হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম মুসলমান। [সূরা আন্'আম: আয়াত-১৬৩-১৬৪, কান্‌যুল ঈমান]

দুই. قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ O

তরজমা: আপনি বলুন, অসম্ভব কল্পনায়, পরম করুণাময়ের যদি কোন সন্তান থাকতো, তবে সর্বপ্রথম আমিই তার ইবাদত করতাম।

[সূরা যুখরুফ: আয়াত-৮১, কান্‌যুল ঈমান]

তিন.

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا O

তরজমা: এবং কোন বস্তু নেই, যা তাঁর প্রশংসাসহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করে না; হ্যাঁ, তোমরা সেগুলোর তাসবীহ্ (পবিত্রতা ঘোষণা করা) অনুধাবন করতে পারোনা, নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

[সূরা বনী ইস্রাঈল: আয়াত-৪৪, কান্‌যুল ঈমান]

এ আয়াতগুলো থেকে দু'টি কথা প্রতীয়মান হয়- **এক.** যমীনের প্রতিটি কণা এবং আসমানের প্রতি অংশ আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠক এবং মহান রবের ইবাদতকারী।

দুই. এ সবের পূর্বে হুযূর-ই আক্‌রাম মহান রবের ইবাদতকারী ছিলেন। অর্থাৎ হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই সময়ে ইবাদতপরায়ণ, যখন না ফেরেশতা ছিলেন, না আসমান ছিলো, না যমীন, না বিশ্বের অন্য কোন জিনিষ। কেননা, যদি কোন জিনিষ হুযূর-ই আক্‌রামের পূর্বে পয়দা হতো, তবে প্রথম ইবাদতকারী সেটাই হতো; হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতেন না।

আর একথাও নিশ্চিত যে, বশরিয়াতের শুরু হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকেই। যদি হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এ প্রথম হওয়ার অবস্থায় বশর (মানুষ) হতেন, তবে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম 'প্রথম বশর' বা 'আবুল বশর' (যথাক্রমে প্রথম মানব বা মানবজাতির পিতা) হতেন না। সুতরাং একথা মানতে হবে যে, হুযূর-ই আক্‌রাম এ প্রথম হওয়ার ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবে নূর। আর এ শরীর বিশিষ্ট অবস্থায় বশর। এ সব আত্মীয়তা এ পবিত্রতম শরীরেরই। হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর এক 'রিসালাহ্' (পুস্তক) 'তা'লীফে ক্বলবে আলীফ'-এর সূচীপত্রের প্রারম্ভে লিখেছেন, 'আলমে আরওয়াহ্' (রূহ জগত)-এ সমস্ত পয়গাম্বর হুযূর-ই আক্‌রামের বরকতমন্ডিত রূহ থেকে বরকত হাসিল করেছেন; তা থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন, আর হুযূর-ই আক্‌রাম থেকে শিখে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম 'সমস্ত বস্তুর নামগুলো'র জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছেন। হুযূর-ই আক্‌রাম এ বিশ্বে নবীগণেরও নবী। যে পয়গাম্বর যা শিখেছেন, তিনি হুযূর-ই আক্‌রামের শাগরিদ হয়েই শিখেছেন। আর হুযূর-ই আক্‌রাম তাঁদের সবার প্রথম ওস্তাদ। হুযূর-ই আক্‌রাম নিজেই এরশাদ করেছেন-

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ

(আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন হযরত আদম রূহ ও দেহের মধ্যভাগে ছিলেন) বরং সমস্ত ফেরেশতা ও সমস্ত আলো বিশিষ্ট বিশ্ব যা কিছু জানে, হুযূর-ই আক্‌রাম বলে দেওয়ার ফলেই জানে। ইবারত নিম্নরূপঃ

وَصْل اَبِّعْلَار ... رول وانتقال اعالم حضرت ا... مدبياء حاضران مجلس علم وسا گردان حوره-درس او هر يكے كتابے ار علم و بابے اردين خوانده و تحصيل نموده بود و هر مسند افاضه نشسته كلمات الله هر خلق افاده وافاضه فرمود - مقدم ايشاں آدم صفى الله آمد كه باوجود نسبت ابوت در درس آں خلف صدق رانوادب رده صحاح لغات واسماء تعليم نموده بود، هر مسند خلافت تكيه رده ساكناں ملأ اعلى را تعليم و تلقين نمود، وحق استادى هر ايشاں ثابت گردانيده مخدوم و مسجود ايشاں گشت -

অর্থ: ওই জগৎ থেকে নেমে সমস্ত পয়গাম্বর হুযূর-ই আক্‌রামের মাদরাসায় হাযির হন এবং তাঁর মকতবে (পাঠশালা) শাগরিদ (ছাত্র) হলেন। প্রত্যেক নবী ইল্‌মের একটি কিতাব (পুস্তক) এবং দ্বীনের একেকটি অধ্যায় হুযূর-ই আক্‌রাম থেকে পড়েছেন। ওখান থেকে সনদ নিয়ে দুনিয়াকে কল্যাণধারা (ফয়য) বিতরণের মসনদে আসীন হন। আর তাঁরা আল্লাহর বিধানাবলীর শিক্ষা সৃষ্টিকে দিলেন। এ পয়গাম্বরদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আদম

আলায়হিস্ সালাম ছিলেন, যিনি পিতা হওয়া সত্ত্বেও আপন এ সাচ্চা সন্তানের পাঠশালায় আদব সহকারে দু'জানু হয়ে বসেছেন, সমস্ত ভাষা ও জিনিষের নামগুলো হুযুর-ই আক্‌রাম থেকে শিখেছেন। তারপর 'আল্লাহর প্রতিনিধি'র মসনদে আসীন হন। আর নৈকট্যধন্য ফেরেশতাদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন; যার ফলে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ওস্তাদ হবার অধিকার সমস্ত ফেরেশতার উপর প্রতিষ্ঠিত হলো, আর শেষ পর্যন্ত তাঁদের 'সাজদাকৃত' (مسجود) হলেন।

আপত্তি- ১১.

যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর হন, তাহলে তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেটের উপর পাথর কেন বেঁধেছেন? এবং তাঁকে বিচ্ছুর দংশনের ফলে সেটার বিষ তাঁর উপর প্রভাব ফেললো কেন? তাঁর উপর যাদুর প্রভাবও কেন পড়লো? কোন কোন পয়গাম্বরকে কাফিরগণ ক্বতল (শহীদ) করলো কীভাবে? উহুদের যুদ্ধে হুযূর-ই আক্‌রামের দাঁত শরীফ কেন শহীদ হলো? নূরও কি ক্ষুধার্ত হতে পারে? নূরের উপরও কি বিষের প্রভাব পড়ে?

খন্ডন

এটা এবং এ ধরনের শতশত আপত্তি তখনই উত্থাপিত হতে পারতো, যখন আমরা হুযুর-ই আক্‌রামের বশরিয়াতের দিকটা অস্বীকার করতাম। আমরা তো বলি- "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূরও, বশরও। কখনো বাশারিয়াতের গুণাবলী তাঁর উপর প্রকাশ পায়, কখনো নূরানিয়াতের। মহান রব তাঁকে সমস্ত গুণের ধারক করে প্রেরণ করেছেন। যদি তিনি স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পানাহার করেন, তাহলে-পেট মুবারকের উপর পাথরও বাঁধতেন এবং ক্ষুধার চিহ্নাবলীও প্রকাশ পেতো; কিন্তু যদি 'সওমে ভেসাল' পালনকালে রোযার নিয়্যতে পানাহার ছেড়ে দিতেন, তাহলে যদি কয়েক মাসও পানাহার না করেন, তাহলে এর কোন প্রভাব পড়তো না। ওখানে বশরিয়াতের বহিঃপ্রকাশ ছিলো, আর এখানে নূরানিয়াতের বহিঃপ্রকাশ। এখানে বিচ্ছুর বিষ, তলোয়ার ও আগুনের প্রভাব দেখা গেছে, কিন্তু মি'রাজের রাতে দোযখে ভ্রমণ করেছেন, ওখানে তো আগুন, সাপ, বিচ্ছু-সবই মওজুদ রয়েছে; কিন্তু কোনটার প্রভাব পড়েনি। ওটা ছিলো 'বশরিয়াত' আর এটা হচ্ছে নূরানিয়াত। আজ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম শতসহস্র বছর ধরে আসমানের উপর জীবিত অবস্থায় অবস্থানরত। ওখানে না বাতাস আছে, না খাদ্য, না পানীয়; কিন্তু আছেন জীবিত। এ জীবিত থাকার মধ্যে তাঁর নূরানিয়াতের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান তো বহু উঁচু ও উত্তম। তাঁর গোলাম, আল্লাহর কোন কোন ওলীর উপরও এমন সময় আসে যে, তাঁরা মাসের পর মাস পানাহার করেন না, তাঁদের শরীরে তলোয়ারের আঘাত লাগেনা। দাজ্জাল যখন আত্মপ্রকাশ করবে, তখন মু'মিনগণ আল্লাহর যিক্র করলেই ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট অনুভব হবে না। এক বুযুর্গ, যাঁকে একবার দাজ্জাল হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। অতঃপর যখন পুনরায় হত্যা করতে চাইবে তখন তাঁর কণ্ঠনালীর উপর তার ছোরা কাজ করবে না। এটা হচ্ছে ওই নুবূয়ত-সূর্যের আলোকরশ্মি মাত্র; সুতরাং খোদ্ সূর্যের কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। শায়খ সা'দী আলায়হির রাহমাহ্ অতি সুন্দর মীমাংসা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন-

گہے با حفصہ و زینب پرداختے - وگاہے با جبرئیل ومیکائیل نہ ساختے

অর্থ: কখনো কখনো (হুযূর-ই আক্রাম) আপন হযরত হাফসাহ্ ও হযরত যয়নাব প্রমুখ পবিত্র স্ত্রীগণের সাথে সদয় অবস্থান করতেন, আবার কখনো কখনো হযরত জিব্রাঈল এবং মীকাঈলও হুযূর-ই আক্রামের নিকট পৌঁছতে পারতেন না।

হুযূর সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন তাজাল্লী (আলো) বিচ্ছুরিত হয়। আপনারা কি শুনেন নি যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর উপর আগুন, হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর উপর ছোরা প্রভাব ফেলেনি? এগুলো ওই বুর্যুগদের নূরানিয়াতের বহিঃপ্রকাশ।

মোটকথা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান রবের নূর। তাঁর বশরিয়াত নূরানী; বরং তাঁর নূরানী বশরিয়াত হযরত জিব্রাঈলের নূরানিয়াত অপেক্ষাও উঁচু এবং উত্তম। মাওলানা রূম বলেন-

اے بہر . اراں جبرئیل اندر بشر - بہر حق سوئے غریباں یک نظر

অর্থ: ওহে শোনো, এ মহান বশরের মধ্যে হাজারো জিব্রাঈলের ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা গরীবদের দিকে একটা মাত্র কৃপাদৃষ্টি দিন!

আপত্তি -১২

যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূর হতেন, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত বংশধর, অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সাইয়্যেদগণ নূর হতেন। কেননা, সন্তানগণ আপন আপন পিতা-মাতার একই

জাতির হয়। মানুষের সন্তান মানুষ, বাঘের বাচ্চা বাঘ। অনুরূপ নূরের সন্তান নূরই হওয়া চাই। যখন সমস্ত সাইয়্যেদ নূর নন, তখন হুযূর-ই আক্রামও নূর নন।

খন্ডন

এর জবাব ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে- হুযূর-ই আক্রামের সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে- হুযূর-ই আক্রামের বশরিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। এসব আত্মীয়তা নূরানিয়াতের নয়। এ নূরানিয়াতে হুযূর-ই আক্রাম না কারো সন্তান, না কারো পিতা (জন্মদাতা), না কারো নিকটাত্মীয়, না আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পৃক্ত। নূরানিয়াতের জগৎ তো বহু উর্ধ্বে। কোন রূহ কারো বংশ কিংবা উৎসমূল নয়। এ কারণে, রূহানী আওলাদ গুণাবলীতে পিতা-মাতার বিপরীতও হয়ে থাকে। যেমন- নবীযাদা (নবীর পুত্র) কাফির, আলিমের পুত্র মূর্খ, মূর্খের সন্তানগণ আলিম বা জ্ঞানীও হয়ে যান। মোটকথা, বেলাদত (জন্ম) বশরিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত, নূরানিয়াতের সাথে নয়।

আপত্তি-১৩

ক্বোরআন থেকে বুঝা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন নুবূয়ত প্রকাশের পূর্বে ঈমান ও ক্বোরআন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। আর ওহী আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজে নবী হবার আশাও করতেন না। অতঃপর এটা কিভাবে সঠিক কথা হতে পারে যে, তিনি 'আলম-ই আরওয়াহ্' (রূহ জগত)-এ নবী ছিলেন? আর সমস্ত নবী তাঁর নিকট থেকে ফয়য গ্রহণ করতেন? একথার পক্ষে দলীল দেখুন-

এক. وَمَاكُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ

তরজমা: এবং আপনি জানতেন না যে, কিতাব আপনার প্রতি প্রেরণ করা হবে। হ্যাঁ, আপনার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেছেন;

[সূরা ক্বাসাস, আয়াত-৮৬, কান্যুল ঈমান]

দুই. مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلاَ الاِ يْمَانُ

তরজমা: এর পূর্বে না আপনি কিতাব জানতেন, না শরীয়তের বিধানাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। [সূরা শূরা, আয়াত-৫২]

যখন হুযূরের নিকট ঈমানেরও খবর ছিলোনা, তখন জন্মের পূর্বে নুবূয়তের (নবী হওয়া)'র অর্থ কি?

খন্ডন

এ আপত্তিরও দু'টি জবাব দেওয়া যায়-১. আপত্তিকারীর আপত্তির উপর ভিত্তি করে (الزامى) এবং ২. গবেষণাধর্মী (تحقيقى)। প্রথমোক্ত (الزامى) জবাবটি হচ্ছে-

তাহলে তো হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকেও অনেক গুণ এগিয়ে আছেন! কারণ, তিনি তো মায়ের কোলে জন্মের মাত্র কয়েক ঘন্টা পর আপন সম্প্রদায়কে বলেছেন-

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللهِ قف اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا

তরজমা: শিশুটি (হযরত ঈসা) বললো, 'আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে অদৃশ্যের সংবাদাতা (নবী) করেছেন।

[সূরা মরিয়মঃ আয়াত-৩০, কানযুল ঈমান]

অনুরূপ, হযরত ইয়াহিয়া আলায়হিস্ সালামও হুযূর-ই আক্রাম থেকে বেড়ে যাবেন। কারণ, তাঁর সম্পর্কে মহান রব বলেছেন-

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

তরজমা: এবং আমি তাকে শৈশবেই হুকুম তথা নুবূয়ত প্রদান করেছি।

[সূরা মরিয়মঃ আয়াত-১২, কানযুল ঈমান]

বরং এ কথা অপরিহার্য হয়ে যাবে যে, কাফিরগণও হুযূর-ই আক্রাম থেকে এগিয়ে যাবে (উত্তম হয়ে যাবে) না'উযুবিল্লাহ্!। কারণ, তারা হুযূর-ই আক্রামকে তাঁর শৈশব থেকে জানতো যে, হুযূর-ই আক্রাম নবী। বাহীরাহ্ রাহিব হুযূর-ই আক্রামের শৈশবে হুযূরের নুবূয়তের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, কেননা, তিনি বৃক্ষ ও পাথরকে কলেমা পড়তে শুনেছেন। ক্বোরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে-

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

তরজমা: তারা এ নবীকে তেমনিভাবে চিনে, যেমন মানুষ তার পুত্র-সন্তানদের চিনে। [সূরা বাক্বারাঃ আয়াত-১৪৬]

অর্থাৎ যেভাবে সন্তানদেরকে পিতা তার শৈশব, বরং জন্মের সময় থেকে চিনেন, তেমনি কাফিরগণ হুযূর-ই আক্রামের শুভ জন্মের সময় থেকে হুযূর-ই আক্রামকে চিনে। আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

তরজমা: এবং এর পূর্বে তারা ওই নবীর ওসীলা ধরে কাফিরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করতো; [সূরা বাক্বারাঃ আয়াত-৮৯, কানযুল ঈমান]

তাছাড়া, সহীহ বোখারী শরীফে আছে যে, সর্বপ্রথম ওহী আসার সময় হুযূর-ই আক্রাম হেরা পর্বতের গুহায় ইবাদত করছিলেন। পূর্ব থেকেই ই'তিকাফ করতে আরম্ভ করেছিলেন। যদি হুযূর 'ঈমান' সম্পর্কে না জানতেন, তা হলে এ ইবাদত কার জন্য করছিলেন? এবং কিভাবে করছিলেন? তাছাড়া, মি'রাজের রাতে হুযূর-ই আক্রাম বায়তুল মুক্বাদ্দাসে সমস্ত নবীকে নামায পড়িয়েছেন। বলুন, সেটা কোন্ নামায ছিলো? কারণ, তখনো তো নামায ফরযই হয়নি।

আর শেষোক্ত অর্থাৎ **গবেষণাধর্মী জবাব** কয়েকটা দেওয়া যায়:

এক. সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, এ আয়াতে বাহ্যত: সম্বোধন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে করা হয়েছে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সম্বোধন হুযূর-ই আক্রামের দ্বীনের অনুসারীদেরকে করা হয়েছে। 'তাফসীর-ই মাদারিক' ও 'তাফসীর-ই খাযিন'-এ আয়াত- الخ... وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا (এবং আপনি আশা করতেন না...আল আয়াত)-এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْخِطَابُ فِى الظَّاهِرِ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَادُ بِهٖ اَهْلُ دِيْنِهٖ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, বাহ্যত এ সম্বোধন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে করা হয়েছে, আর বুঝানো হয়েছে হুযূর-ই আক্রামের উম্মতের কথা।

দুই. ওই প্রথমোক্ত আয়াত- ...مَاكُنْتَ تَرْجُوْا (আপনি আশা করতেন না...)-এর নাবোধক অর্থ (نفى) اِلاَّ رَحْمَةً (কিন্তু আল্লাহর রহমত) দ্বারা খতম হয়ে গেছে। আর অর্থ এ দাঁড়ালো যে, 'আপনার বাহ্যিক উপকরণাদির অনুসারে, এ আশাও ছিলো না যে, আল্লাহর রহমত ব্যতীত আপনার উপর ওহী আসবে।' প্রকাশ থাকে যে, হুযূর-ই আক্রাম-এর নুবূয়ত শুধু মহান রবের অনুগ্রহ দ্বারাই অর্জিত হয়েছে; কোন নবীর উত্তরাধিকার হিসেবে অর্জিত হয়নি। যেমন, হারুন আলায়হিস্ সালাম-এর নুবূয়ত হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর দো'আয় অর্জিত ছিলো। আর হযরত ইয়াহিয়া আলায়হিস্ সালাম-এর নুবূয়ত হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম-এর উত্তরাধিকারের মাধ্যমে এবং হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর নুবূয়ত হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম-এর মীরাস ছিলো। মহান রবই এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

এক. وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ

তরজমা: এবং সুলায়মান দাউদের স্থলাভিষিক্ত হলো (ওয়ারিস হলো)।

[সূরা নাম্‌লঃ আয়াত-১৬, কানযুল ঈমান]

দুই. وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ ۙ هٰرُوْنَ اَخِى ۙ اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِىْ ۙ

তরজমা: ২৯।। এবং আমার জন্য আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে একজন উযীর করে দাও, ৩০।। সে কে? আমার ভাই হারূন; ৩১।। তার দ্বারা আমার কোমর শক্ত করো। [সূরা ত্বোয়াহা, আয়াত-২৯,৩০ ও ৩১, কানযুল ঈমান]

কিন্তু হুযূর-ই আক্রামের নুবূয়তের ক্ষেত্রে কারো সরাসরি দো'আ কিংবা মীরাস (উত্তরাধিকার)-এর মাধ্যম নেই এবং হুযূর-ই আক্রামের উপর কারো ইহসান নেই।

বাকী রইলো- শেষোক্ত আয়াত (আয়াত-২) وَمَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَاالْكِتٰبُ ...الاية -এর মর্মার্থ। এ আয়াতে 'দিরায়ত' (تدرى -এর درايت)-এর অস্বীকার (نفى) করা হয়েছে। 'দিরায়ত' (درايت) বলা হয় বিবেক বা আন্দাজ-অনুমান দ্বারা জেনে নেওয়াকে। অর্থাৎ হে হাবীব! আপনি নুবূয়ত প্রকাশ বা ঘোষণার পূর্বে ঈমান ও কিতাব নিছক আন্দাজ বা অনুমান দ্বারা জানতেন না। কেননা, আন্দাজ-অনুমান দ্বারা অর্জিত জ্ঞান কখনো ভুলও হতে পারে; বরং 'ইলহাম-ই রব্বানী' (মহান রবের অনুপ্রেরণা) থেকে জানতেন; যাতে কোন প্রকার ভুলের সম্ভাবনা নেই। অথবা এটা দ্বারা কিতাব ও ঈমানের বিস্তারিত বিধানাবলী বুঝানো হয়েছে। অথবা 'ঈমান' মানে 'ঈমানদারগণ'। মোটকথা এর বহু জবাব রয়েছে।

আপত্তি- ১৪

সহীহ্ বোখারী শরীফের প্রারম্ভে উল্লিখিত রেওয়ায়ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যখন হেরা পর্ব্বতের গূহায় হুযূর-ই আক্রামের উপর প্রথম ওহী (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) (পড়ুন আপনার রবের নামে) নাযিল হলো, তখন হুযূর-ই আক্রাম হযরত জিব্রাঈলকে চিনতে পারেননি। ওয়রাক্বাহ্ ইবনে নওফল বলে দেওয়ায় চিনেছেন যে, তিনি জিব্রাঈল। তখন এটা কিভাবে দুরস্ত হলো যে, হুযূর আপন নুবূয়তের পূর্ব থেকে জানতেন?

খন্ডন

এটা ভুল কথা। বোখারী শরীফের এ বর্ণনায় এমন কোন শব্দ নেই, যার অর্থ এ হয় যে, হুযূর-ই আক্রাম হযরত জিব্রাঈলকে চিনেননি। যদি হুযূর-ই আক্রাম হযরত জিব্রাঈলকে না চিনতেন, তাহলে এ আয়াত (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) অকাট্য থাকতো না। কেননা, আয়াত তখনই অকাট্য হয়, যখন তা আল্লাহর কালাম (বাণী) হওয়ার মধ্যে কোন ধরনের সংশয়-সন্দেহ থাকে না। আর যদি হুযূর আক্রামের একথা জানা না থাকে যে, ইনি ফেরেশতা, না কি অন্য কেউ, তখন তো একথা জানাই যেতো না যে, এটা মহান রবেরই বাণী। আর যখন হুযূর-ই আক্রামের এ আয়াত আল্লাহর বাণী হওয়ার মধ্যে সন্দেহ থাকে, তখন আমাদের এতে নিশ্চিত বিশ্বাস কখনো হতে পারে না। কেননা, আমাদের ইয়াক্বীন (নিশ্চিত বিশ্বাস) তো হুযূর-ই আক্রামের ইয়াক্বীনের উপর নির্ভরশীল ও প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে, এখন হুযূর-ই আন্ওয়ার হযরত জিব্রাঈলকে একথা জিজ্ঞাসা করেন নি যে, 'তুমি কে?' এবং 'আমার দ্বারা কী পড়াতে চাচ্ছো?' বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জানতেন, নিতেন। চিনবেনও না কেন? হযরত জিব্রাঈল এবং সমগ্র বিশ্ব হুযূর-ই আক্রামের নূর থেকে সৃষ্ট। আর হুযূর-ই আক্রামের নূর তাঁদের সবার পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে।

বাকী রইলো ওয়ারক্বাহ্ ইবনে নওফলের নিকট তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার বিষয়। বস্তুত, ওয়ারক্বাহ্ ইবনে নওফলের একথা আরয করা অন্যান্যদের সত্যায়নের জন্য ছিলো। অর্থাৎ শ্রোতারা ওয়ারক্বাহ্ ইবনে নওফল থেকে একথা শুনে হুযূর-ই আক্রামের নুবূয়তের ব্যাপারে আরো বেশি নিশ্চিত হয়ে যাবে। কেননা, ওয়ারক্বাহ্ তাওরীতের বড় আলিম ছিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁর জ্ঞান ও সৎকর্মের কথা স্বীকার করতো এবং তাঁর উপর নির্ভর করতো। মোটকথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিবি খাদীজাতুল কুব্রার সাথে ওয়ারক্বাহ্ ইবনে নওফলের নিকট যাওয়া নিজের জ্ঞানার্জনের জন্য ছিলোনা; বরং তাঁর মাধ্যমে সত্যায়ন করানোর জন্যই ছিলো; যাতে হযরত খাদীজার মনেও হুযূর-ই আক্রামের নুবূয়ত সম্পর্কে 'আয়নুল ইয়াক্বীন' (চাক্ষুষভাবে নিশ্চিত বিশ্বাস) হাসিল হয়ে যায়। আর অন্যান্যরা 'ইল্মুল ইয়াক্বীন' (নিশ্চিত জ্ঞান) অর্জন করতে পারে। যেমন, হুযূর পাথরগুলো দ্বারাও কলেমা পড়িয়েছেন, গাছপালা দ্বারা সাক্ষী প্রদান করিয়েছেন। এগুলো নিজের জ্ঞানার্জনের নয়; বরং অন্যান্যদের দ্বারা স্বীকার করানোর জন্য ছিলো।

আপত্তি-১৫

'নূর' থেকে 'বশর' উত্তম। দেখুন হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে। তিনি বশর ছিলেন, নূরী ফেরেশতারা তাঁকে সাজদা করেছেন। আর মি'রাজে হুযূর বশর হওয়া সত্ত্বেও আরশেরও উপরে পৌঁছেছেন; যেমন 'ওখানে' 'কোথায়' সবই খতম হয়ে গেছে। অথচ নূরী জিব্রাঈল 'সিদ্রাতুল মুন্তাহা'য় রয়ে গেছেন। সুতরাং হুযূরকে 'নূর' বলা হুযূরের মানহানি করার সামিল।

খন্ডন

প্রথমত, এ 'নিয়ম'ই ভুল যে, বশর নূর অপেক্ষা নিঃশর্তভাবে উত্তম। অন্যথায় তখন তোমরা, বরং আবূ জাহল প্রমুখও ফেরেশতাদের থেকে উত্তম হয়ে যাওয়া অনিবার্য হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, এ আপত্তি তখনই সঠিক হতো, যখন আমরা (আহলে সুন্নাত) হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'বশরিয়াত'কে অস্বীকার করতাম। হুযূর তো নূরও, বশরও। নিছক বশর ও নিছক নূর থেকে তিনিই উত্তম, যিনি নূরও, বশরও। স্মরণ রাখবেন, কাফির মানুষ কুকুর-বিড়াল থেকেও নিকৃষ্ট। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (তারা সৃষ্টিকূলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। [সূরা রাইয়্যেনাহ্: আয়াত-৫, কান্যুল ঈমান]

---o---

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছায়াহীন কায়া শরীফ

আল্লাহ্ তা'আলা আপন মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যেখানে অন্যান্য শত-সহস্র মু'জিযা দান করেছেন, সেখানে এ মু'জিযাও দান করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর মুবারককে ছায়াহীন করেছেন। রোদ, চাঁদের আলো ও চেরাগ-প্রদীপ ইত্যাদির আলোয় তাঁর পবিত্রতম দেহ শরীফের মোটেই ছায়া পড়তোনা। এমনকি যে পোষাক হুযূর-ই আন্ওয়ার পরতেন ওই পোষাকও ছায়াহীন হয়ে যেতো। এর পক্ষে ক্বোরআন-ই করীমের আয়াতসমূহ, সহীহ্ হাদীসসমূহ, ফক্বীহ্গণের অভিমতসমূহ, বরং স্বয়ং দেওবন্দী-ওহাবী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মন্তব্যও সাক্ষী রয়েছে। এখন দেখুন এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ-

প্রথম পরিচ্ছেদ

পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতসমূহের আলোকে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছায়াহীন

এক. قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

তরজমা: নিশ্চয়, হে লোকেরা, তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট থেকে নূর (হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা) তাশরীফ এনেছেন এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। [সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত-১৫]

দুই.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا O
وَدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا O

তরজমা: হে নবী, নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি হাযির-নাযির, সুসংবাদদাতা, ভয়ের বাণী শুনান এমন এবং আল্লাহর দিকে, তাঁরই অনুমতিক্রমে, আহ্বানকারী আর আলোকিতকারী সূর্যরূপে।

[সূরা আহযাব: আয়াত-৪৪, ৪৫, কান্যুল ঈমান]

তিন. مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ؕ

তরজমা: আল্লাহর নূর (মুহাম্মদ মোস্তফা)-এর উপমা তেমনি, যেমন একটা থাক, যাতে একটি চেরাগ রয়েছে, চিমনীর মধ্যে স্থাপিত। [সূরা নূর: আয়াত-৩৫]

আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমোক্ত আয়াতে হুযুর-ই আক্রামকে 'নূর' বলেছেন; দ্বিতীয় আয়াতে সূর্য বলেছেন। আর তৃতীয় আয়াতে হুযূর-ই আক্রাম-এর যাত (সত্তা মুবারক)কে নূর এবং পবিত্র বক্ষকে চেরাগের চিমনি (ফানুস) বলেছেন। একথা সুস্পষ্ট যে, না নূরের ছায়া থাকে, না সূর্যের, না পরিষ্কার চিমনীর। এ আয়াতগুলো থেকে হুযূর-ই আক্রাম ছায়াহীন হবার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

হাদীস শরীফের আলোকে ছায়াহীন কায়া শরীফ

এক. 'তাফসীর-ই মাদারিক' শরীফ: ১৮শ পারা: সূরা নূর-এর আয়াত- (لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ) -এর তাফসীর (ব্যাখ্যা)-এ একটা ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, কিছুলোক উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বিরুদ্ধে অপবাদ রচনা করলো। হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত সাহাবীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। তখন হযরত যুন্নুরাঈন ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর-ই আক্রামের মহান দরবারে যা আরয করেছেন, তা নিম্নরূপঃ

قَالَ عُثْمَانُ اِنَّ اللهَ مَا اَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ لِئَلاَّ يُوْقِعَ اِنْسَانٌ قَدَمَهٗ عَلٰى ظِلِّكَ الظِّلِّ فَلَمَّا لَمْ يُمَكِّنْ اَحَدًا مِنْ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلٰى ظِلِّكَ كَيْفَ يُمَكِّنُ اَحَدًا مِّنْ تَلْوِيْثِ عِرْضِ زَوْجِكَ؟

অর্থ: হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল, মহান আল্লাহ্ আপনার ছায়াকে যমীনের উপর ফেলতে দেননি, যাতে কেউ ওই ছায়া শরীফের উপর কদম রাখতে না পারে। সুতরাং যখন মহান রব কাউকে আপনার ছায়া শরীফের উপর পা রাখার সুযোগ দেননি, তখন কাউকে এ ক্ষমতা কীভাবে দেবেন যে, আপনার পবিত্র স্ত্রীর পবিত্রতার উপর দাগ লাগাতে পারে?

দুই. হযরত খলীফাতুল মুসলিমীন আমীরুল মু'মিনীন ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এভাবে আরয করেছেন-

اِنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا قَاطِعٌ بِكِذْبِ الْمُنَافِقِيْنَ لِاَنَّ اللهَ عَصَمَكَ مِنْ وُقُوْعِ الذُّبَابِ عَلٰى ثِيَابِكَ لِاَنَّهٗ يَقَعُ عَلَى النَّجَاسَتِ فَيَتَلَطَّخُ بِهَا فَلَمَّا عَصَمَكَ مِنْ ذٰلِكَ الْوَتَرِ فَكَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ مِنْ صُحْبَةِ مَنْ تَكُوْنُ مُتَلَطِّخَةً يَعْنِىْ هٰذِهِ الْفَاحِشَةَ

অর্থ: হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করেছেন, মুনাফিক্বদের মিথ্যুক হবার

ব্যাপারে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার শরীর মুবারককে মাছি বসা থেকে রক্ষা করেছেন। কেননা, মাছি অপবিত্র জিনিষগুলোর উপর বসে, যেগুলোতে সেটা লেপ্টে যায়। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এ পরিমান অপবিত্র বস্তু থেকে রক্ষা করেছেন, তখন ওই স্ত্রীর সঙ্গ থেকে কেন বাঁচাবেন না, যে এমন মন্দ কাজের সাথে জড়িয়ে যায়?

হযরত ওসমানের বর্ণনা থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আন্ওয়ারের পবিত্রতম শরীর ছায়াহীন। আর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনা থেকে বুঝা গেলো যে, তাঁর পবিত্র শরীরের উপর কখনো মাছি বসেনি। হুযূর-ই আক্রামের শরীর মুবারক ছায়াহীন হওয়াও তাঁর মু'জিযা। শরীর মুবারকের উপর মাছি না বসাও মু'জিযা।

তিন. হাকীম তিরমিযী তাঁর কিতাব 'নাওয়াদিরুল উসূল'-এ হযরত যাক্ওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ ذَكْوَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرٰى لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ

অর্থ: হযরত যাক্ওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া না রোদে দেখা যেতো, না চাঁদের আলোতে।

চার. সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক এবং হাফেয আল্লামা ইবনে জূযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ اِلَّا غَلَبَهٗ ضَوْءُهٗ ضَوْءَهَا وَلَا مَعَ سِرَاجٍ اِلَّا ضَوْءُهٗ ضَوْءَهٗ

অর্থ: তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া ছিলো না। আর তিনি যখনই সূর্যের সামনে দাঁড়িয়েছেন। তখন তাঁর আলো (নূর) সূর্যের আলো অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল থাকতো, আর তিনি যখনই চেরাগের সামনে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর নূর চেরাগের নূর বা আলোকে দমিয়ে ফেলতো।

পাঁচ. বায়হাক্বী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মু'আয়ক্বিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ حَجَجْتُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَدَخَلْتُ دَارًا بِمَكَّةَ فَرَاَيْتُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهٗ كَدَآئِرَةِ الْقَمَرِ

অর্থঃ তিনি বলেছেন, আমি বিদায় হজ্জে শরীক হয়েছি। তখন আমি মক্কা মুকার্‌রমায় একটি ঘরে গেলাম। আমি তাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। তাঁর চেহারা শরীফ চাঁদের বৃত্তের ন্যায় চমকাচ্ছিলো।

ছয়. ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি আপন কিতাব 'খাসাইসে কুব্‌রা' শরীফে হযরত যাক্‌ওয়ানের বর্ণিত হাদীস, যা এখন উল্লেখ করা হয়েছে, সম্পর্কে একটা অধ্যায় রচনা করেছেন। ওই অধ্যায়ে তিনি বলেছেন-

قَالَ اِبْنُ سَمِيْعٍ مِنْ فَضَآئِلِهٖصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ ظِلَّهٗكَانَ لاَ يَقَعُ عَلَى الْاَرْضِ وَاِنَّهٗ كَانَ نُوْرًا فَكَانَ اِذَا مَشٰى فِى الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لاَ يُنْظَرُ لَهٗ ظِلٌّ

অর্থঃ হযরত ইবনে সামী' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এটাও আছে যে, তাঁর ছায়া যমীনের উপর পড়তোনা। আর তিনি যখন রোদ কিংবা চাঁদের আলোতে চলতেন, তখন তাঁর ছায়া দেখা যেতোনা।

সাত. এক বিশদ বিবরণ সম্বলিত কিতাব 'আল ফাউযাজুল লাবীব ফী খাসা-ইসিল হাবীব' (الفوذج اللبيب فى خصائص الحبيب): দ্বিতীয় অধ্যায়: ৪র্থ পরিচ্ছেদ-এ বলেন-

لَمْ يَقَعْ ظِلُّهٗ عَلَى الْاَرْضِ وَلاَ رُءِىَ لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَلاَ قَمَرٍ

অর্থঃ হুযূর-ই আক্‌রামের ছায়া যমীনের উপর পড়তো না এবং তাঁর ছায়া রোদে দেখা যায়নি, চাঁদের আলোতেও না।

আট. হযরত ক্বাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'শেফা' শরীফে লিখেছেন-

وَمَا ذُكِرَ مِنْ اَنَّهٗ لاَظِلَّ لِشَخْصِهٖ فِىْ شَمْسٍ وَلاَ قَمَرٍ لِاَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا

অর্থঃ আর যা উল্লেখ করা হয়েছে-, হুযূর-ই আক্‌রামের নূরানী শরীরে ছায়া নেই, রোদে, না চাঁদের আলোতে- এটা এজন্য যে, হুযূর-ই আক্‌রাম নূর।

নয়. হযরত ইমাম শিহাব উদ্দীন খাফ্‌ফাজী সেটার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নাসীমুর রিয়াদ্ব'-এ লিখেছেন-

وَمِنْ دَلاَئِلِ نُبُوَّتِهٖصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذُكِرَ مِنْ اَنَّهٗ لاَظِلَّ لِشَخْصِهٖ اَىْ جَسَدِهِ الشَّرِيْفِ اللَّطِيْفِ اِذَا كَانَ فِىْ شَمْسٍ اَوْ قَمَرٍ لِاَنَّهٗصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نُوْرًا وَالْاَنْوَارُ شَفَافَةٌ لَطِيْفَةٌ لاَ تَحْجُبُ غَيْرَهَا - وَالْاَنْوَارُ لاَظِلَّ بِهَا كَمَا تُشَاهَدُ فِى الْاَنْوَارِ الْحَقِيْقَةِ وَهٰذَا رَوَاهُ صَاحِبُ

الْوَفَآءِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ اِلاَّ غَلَبَ ضُوْءُضُوْءَهَا وَلاَ مَعَ السِّرَاجِ اِلاَّ غَلَبَ ضُوْءُهٗ ضَوْءَ هٗوَقَدْ تَقَدَّمَ هٰذَا وَالْكَلاَمُ فِيْهِ وَقَدْ نَطَقَ الْقُرْاٰنُ بِاَنَّهُالنُّوْرُ الْمُبِيْنُ وَكَوْنُهٗ بَشَرًا لاَ يُنَافِيْهِ كَمَا تُوُهِّمَ فَاِنْ فَهِمْتَ فَهُوَ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ فَاِنَّ النُّوْرَ هُوَ الظَّاهِرُ بِنَفْسِهِ الْمُظْهِرُ بَعْدَهٗ وَتَفْصِيْلُهٗ فِىْ مِشْكٰوةِ الْاَنْوَارِ - (مُلَخَّصًا)

অর্থঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুবূয়তের দলীলগুলোর মধ্যে সেটাও রয়েছে, যা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে- হুযূর-ই আক্‌রামের সুক্ষ্ম শরীর মুবারকের ছায়া ছিলোনা, যখন তিনি রোদ কিংবা চাঁদের আলোতে দাঁড়াতেন। কেননা হুযূর-ই আক্‌রাম নূর। বস্তুত: নূররাশি স্বচ্ছ ও সুক্ষ্ম হয়। কারো জন্য অন্তরাল হয় না। নূর রাশির ছায়া থাকেনা, যেমন প্রকৃত নূরগুলোতে দেখা যায়। 'কিতাবুল ওয়াফা' প্রণেতা মহোদয় হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া ছিলো না। তিনি যখনই রোদ কিংবা চেরাগের আলোয় দাঁড়াতেন, তখন তাঁর চমক ওইগুলোর চমকের উপর বিজয়ী (অধিকতর উজ্জ্বল) হতো। এসব কথা ও এতদ্‌সম্পর্কিত আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

ক্বোরআন-ই করীম এরশাদ করছে- হুযূর-ই আক্‌রাম হলেন সুস্পষ্ট নূর। আর তিনি বশর হওয়া এর পরিপন্থী (বিপরীত বা বিরোধী) নয়; যেমনটি সন্দেহ করা হয়েছে। সুতরাং তুমি বুঝতে পারলে তো 'হুযূর নূরুন্ আলা নূর' (হুযূর-ই আক্‌রাম নূরের উপর নূর) হলেন। কেননা, নূর হয় সেটাই, যা নিজেও সুস্পষ্ট, অন্যকেও সুস্পষ্ট করে দেয়। এর বিস্তারিত বিবরণ 'মিশকাতুল আন্‌ওয়ার'-এ রয়েছে। (সংক্ষেপিত)।

অন্যান্য মনীষীদের অভিমতসমূহ

এক. হযরত মৌলভী জালাল উদ্দীন রূমী কুদ্দিসা সির্‌রুহূ তাঁর 'মসনভী শরীফ'-এ লিখেছেন- جو فنا شي ار فقر پيرايه بود -او محمد دار بے سایہ بود

অর্থ: যে ফক্বীর হুযূর-ই আক্‌রামের সত্তা মুবারকে ফানা বা বিলীন হয়, সেও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার মতো ছায়াহীন হয়।

দুই. হযরত মাওলানা আবদুল আলী বাহরুল উলূম মসনভী শরীফের ব্যাখ্যায় এ পংক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন-

مصرع ثانی معجزہ آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم راسایہ نمی افتاد

অর্থ: দ্বিতীয় চরণে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর ছায়া পড়তো না।

তিন. ইমাম আহমদ্ ইবনে খাত্বীব ক্বাস্তলানী 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াহ' শরীফে লিখেছেন-

لَمْ يَكُنْ لَّهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَلاَ فِىْ قَمَرٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ ذَكْوَانَ

অর্থ: হুযূর-ই আক্‌রামের ছায়া ছিলোনা। না সূর্যের রোদে, না চাঁদের আলোতে। যেমনটি তিরমিযী শরীফে হযরত যাক্‌ওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

চার. আল্লামা হোসাঈন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ার বকরী তাঁর কিতাব 'আলখাম্‌সীন ফী আহওয়ালিন নাফসিন নাফীস'-এ লিখেছেন-

لَمْ يَقَعْ ظِلُّهٗ عَلَى الْاَرْضِ وَلاَ رُءِىَ لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَلاَ فِىْ قَمَرٍ

অর্থ: হুযূর-ই আক্‌রামের ছায়া যমীনের উপর পড়েনি এবং তাঁর ছায়া দেখা যায়নি রোদে, না চাঁদের আলোতে।

পাঁচ. 'নূরুল আবসার ফী মানা-ক্বিবি আ-লিন্ নাবিয়্যিল আত্বহার' নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

لَمْ يَقَعْ ظِلُّهٗ عَلَى الْاَرْضِ وَلاَ رُءِىَ لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَلاَ فِىْ قَمَرٍ

অর্থ: হুযূর-ই আক্‌রামের ছায়া যমীনের উপর পড়েনি। তাঁর ছায়া না রোদে দেখা গেছে, না চাঁদের আলোতে।

ছয়. 'আফদ্বালুল ক্বোরা' নামক কিতাবে ইমাম ইবনে হাজর মক্কী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি লিখেছেন-

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ اَنَّهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ نُوْرًا اِذْ كَانَ يَمْشِىْ فِى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لاَ يَظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ لِاَنَّهٗ لاَيَظْهَرُ اِلاَّ بِكَثِيْفٍ وَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَلَّصَهُ اللهُ مِنْ سَآئِرِ الْكَثَافَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَصَيَّرَهٗ نُوْرًا صَرَفًا لاَ يَظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ اَصْلاً

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূর হওয়ার পক্ষে সমর্থনকারী দলীলাদির মধ্যে একটা এও রয়েছে যে, তিনি যখন রোদে কিংবা চাঁদের আলোতে চলতেন, তখন তাঁর ছায়া প্রকাশ পেতোনা। কেননা, ছায়া শুধু জড় পদার্থেরই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর-ই আক্‌রামকে দৈহিক সমস্ত জড়তা থেকে মুক্ত করেছেন, তাঁকে খাঁটি নূর করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ছায়া একেবারে প্রকাশ পেতোনা।

সাত. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী কুদ্দিসা সির্‌রুহু তাঁর কিতাব 'মাদারিজুন্নুবূয়ত'-এ লিখেছেন-

ونبود مرآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راسایہ درآفتاب نہ در قمر

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া ছিলোনা- না রোদে, না চাঁদের আলোতে।

এটা হাকীম তিরমিযী হযরত যাক্‌ওয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। এটা তাঁর কিতাব 'নাওয়াদিরুল উসূল'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন।

আট. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী কুত্ববে রব্বানী কুদ্দিসা সির্‌রুহু তাঁর 'মাকতূবাত শরীফ: ৩য় খন্ড: মাকতূব নম্বর-১০০'-এ লিখেছেন-

اورا صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبود -درعالم شہادت سایہ ہر شخص ار شخص لطیف تراست چوں لطیف تر اروے صلی اللہ علیہ وسلم در عالم نباشد اورا سایہ چہ صورت دارد

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া ছিলোনা। এ দৃশ্য জগতে প্রত্যেক শরীরের ছায়া শরীর অপেক্ষা বেশী সুক্ষ্ম হয়। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বেশী সুক্ষ্ম দুনিয়ায় অন্য কিছুই নেই, তখন কি তাঁর ছায়া থাকার কোন সূরত বা কারণ থাকতে পারে?

নয়. হযরত শাহ্ আবদুল আযীয সাহেব কুদ্দিসা সির্‌রুহু তাঁর 'তাফসীর-ই আযীযী; ৩০তম পারা: সূরা ওয়াদ্ব দ্বোহা'-এর তাফসীর-এ লিখেছেন-

سایہ ایشاں بر زمین نمی افتاد

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া যমীনের উপর পড়তোন না।

দশ. ‘মাজমা‘উল বিহার’-এ (شى) (শাই)-এর রহস্য প্রসঙ্গে ‘শরহে শেফা’ (شرح شفا)-এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে-

مِنْ اَسْمَآئِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنُّوْرُ قِيْلَ مِنْ خَصَآئِصِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ اِذَا مَشٰى فِى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا يَظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নামগুলোর মধ্যে একটি নাম ‘নূর’ও রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে- তিনি যখন রোদে কিংবা চাঁদের আলোতে চলতেন, তখন তাঁর ছায়া প্রকাশ পেতো না।

এগার. আল্লামা সুবহান হামালী ‘ফুতূহাত-ই আহমদিয়া শরহে হামাযিয়াহ্’য় লিখেছেন-

لَمْ يَكُنْ لَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ مَا يَظْهَرُ فِى الشَّمْسِ وَلَا فِى الْقَمَرِ

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এমন কোন ছায়া ছিলোনা, যা রোদ কিংবা চাঁদের আলোতে প্রকাশ পেতো।

বার. ‘জাওয়াহিরুল বিহার’ শরীফ: প্রথম খন্ড, পৃ. ৪৫৩-তে আল্লামা ইয়ূসুফ নাবহানী লিখেছেন-

وَكَانَ اِذَا مَشٰى فِى قَمَرٍ اَوْ شَمْسٍ لَا يَظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ

অর্থ: হুযূর-ই আক্রাম যখন রোদ কিংবা চাঁদের আলোতে চলতেন, তখন তাঁর ছায়া প্রকাশ পেতো না।

উপরিউক্ত হাদীস শরীফসমূহ এবং বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরামের বাণীগুলো থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্রতম শরীরে ছায়া মোটেই ছিলোনা- না রোদে, না চাঁদের আলোতে, না চেরাগ বা প্রদীপের আলোতে।

ওহাবী-দেওবন্দীদের সমর্থন

হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী শরীরের ছায়া না থাকার বিষয়টা দেওবন্দের আলিমগণ এবং গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) আলিমগণও মেনে নিয়েছেন। তারা এর পক্ষে জোরে শোরে দলীলাদিও পেশ করে থাকেন। জানিনা বর্তমানকার দেওবন্দীদের উপর কি অভিশাপ হয়েছে যে, তারা তাদের মুরব্বীদের কথাও মানছেনা। আর এ বিষয়টাকে অস্বীকারই করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বুঝ শক্তি দান করুন, হঠকারিতার স্থলে সত্যকে গ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করুন।

এখন আপনারা দেওবন্দী আলিমদের মন্তব্যাদি দেখুন-

এক. দেওবন্দীদের পেশ্ওয়া (নেতা) মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব তাঁর কিতাব ‘ইমদাদুস্ সুলূক’: পৃ. ৮৬-তে লিখেছেন-

بتواتر ثابت شد کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نداشتند -
وظاہر است کہ بجز نور ہمہ اجسام ظل می دارند .

অর্থ: একথা প্রতিটি যুগে অগণিত বর্ণনাকারীর সূত্রে (بتواتر) প্রমাণিত সত্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছায়া ধারণ করতেন না। একথা প্রকাশ্য যে, নূর ব্যতীত সমস্ত শরীর ছায়া ধারণ করে।

বন্ধুরা! এটা হচ্ছে ওই মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেবের আক্বীদা, যিনি সমস্ত দেওবন্দীদের বড় আলিম ও পীর; বরং তথাকথিত ‘কুত্ববে ওয়াক্বত’ (যুগের কুত্বব), জানি না আরো কি কি!

দুই. গায়র মুক্বাল্লিদ (আহলে হাদীস)-এর স্বনামধন্য আলিম হাফেয মুহাম্মদ লখভী সাহেব তাঁর ‘তাফসীর-ই মুহাম্মদী’: সপ্তম মানযিল: পৃ. ৪২৯-এ লিখেছেন-

جاں گرمی سخت ہوندی ، سیاں سر پر بدل سایہ کردا
تے اوپر زمین نہ پوندا سایہ حضرت پیغمبر دا

অর্থ: দিন দুপুরে কড়া রোদেও হযরত পয়গাম্বরে খোদা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া যমীনে পড়তোনা।

এ হলো আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বড়-ভারী আলিম হাফেয মুহাম্মদ লখভী সাহেবের মত। তা হচ্ছে- হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী শরীর ছায়াবিহীন।

বিবেক বা যুক্তিগ্রাহ্য দলীলাদি

বিবেক বা যুক্তির দাবীও হচ্ছে- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী শরীরের ছায়া না থাকা। কেননা, দেহ জগতে কিছু কিছু স্পর্শ করা যায় এমন দেহও রয়েছে, যেগুলোর ছায়া থাকে না। অর্থাৎ ওইগুলোতো শরীরই; কিন্তু ছায়া ধারণ করেনা, তাও হয়তো এজন্য যে, ওইসব দেহের উপর নূরের পলিশ মহা শক্তিধর আল্লাহই করে দিয়েছেন; অথবা এজন্য যে, ওইগুলো স্বচ্ছ। দেখুন-চাঁদ, সূর্য, তারকাপুঞ্জ। এগুলোর দেহ আছে, স্পর্শও করা যায়; কিন্তু ওইগুলোর ছায়া নেই। কেননা, তা শুধু এজন্যই যে, ওইগুলোর উপর নূরের পলিশ রয়েছে। চাঁদ ও তারাগুলো স্বয়ং দৈহিকভাবে কালো; কিন্তু সূর্যের প্রতিবিম্বগুলোর মাধ্যমে আলোকিত

হয়ে গেছে। এ সাময়িক নূরানিয়াতের কারণে ওইগুলোর ছায়া নেই। অনেক স্বচ্ছ আয়নার ছায়া পড়ে না। যখন বারংবার দেখা গেছে যে, আয়না নূর নয়; শুধু স্বচ্ছ হওয়াই সেটাকে ছায়াহীন করে দিয়েছে। কোন কোন অবস্থায় জড় পদার্থেরও ছায়া হয় না, যখন চতুর্দিক থেকে এর উপর আলোকপাত করা হয়, অথবা কেউ বিজলীর নিচে দন্ডায়মান হয়ে যায়, তবে তার ছায়া হবে না। কেননা, তাকে নূর পরিবেষ্টন করে নেয়। গ্রীষ্মকালে দুপুর বেলায় যখন সূর্য একেবারে মাথার উপর থাকে, তখন মানুষের শরীর বরং কোন জিনিষেরই ছায়া পড়ে না। কেননা, সূর্যের আলো শরীরের সকল অংশের উপর পড়ে। যদি বিদ্যুতের জ্বলন্ত বাল্ব নিজেও আলোকিত হলো এবং এর উপর জ্বলন্ত বাল্ব থেকে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটানো হয়, তবে তো সেটা 'নূরুন 'আলা নূর' (নূরের উপর নূর) হয়ে যাবে। সেখানে ছায়া পড়ার প্রশ্নই আসবে না। যখন এসব যাহেরী দেহের সাময়িক আলোরশির কারণে ছায়া থাকে না, তখন হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, যাঁকে মহান রব সশরীর নূর করেছেন, আর হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেও দো'আ করেছেন- (اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ نُوْرًا) (হে আল্লাহ্! আমাকে নূর করে দাও!) আর মহামহিম রব ক্বোরআন মজীদে তাঁকে 'নূরুন 'আলা নূর' নূরের উপর নূর বলেছেন, (দেখুন, সূরা-ই নূর শরীফ), যদি এ পবিত্র শরীরের ছায়া না থাকে, তবে আশ্চর্যের কি আছে? উপরোক্ত সমস্ত দেহকে যদি ছায়াহীন বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ছায়াহীন বলে মানতে অস্বীকৃতি কেন?

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন

ছায়াহীন কায়ার মাস্আলায় বিরুদ্ধবাদীদের নিকট কোন মজবূত আপত্তি নেই, দু/তিনটি সংশয় রয়েছে মাত্র, যেগুলো তারা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে বেড়িয়ে থাকে। সুতরাং আমি তাদের ওই আপত্তিগুলো খন্ডন সহকারে আরয করছি। মহান রব কবূল করুন!

আপত্তি-১.

'মুস্নাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল'-এ বিবি সফিয়্যাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বর্ণনা সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَّ يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِوَاِذَا اَنَا بِظِلِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مقبل)

অর্থ: তিনি বলেন, একদিন দিন-দুপুরে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন, আমি তখন হুযূরের ছায়ায় ছিলাম।

দেখুন, হযরত সফিয়্যাহ্ বলেছেন, 'আমি হুযূরের ছায়ায় ছিলাম'। যদি হুযূরের ছায়া না থাকতো, তবে তিনি ছায়ায় কীভাবে থাকতে পারেন? ظل (ছায়া) শব্দের দিকে গভীর মনযোগ দিন! ظل (যিল্ল) ছায়াকেই বলা হয়।

নোট. কোন দেওবন্দী-ওহাবী হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া প্রমাণ করার জন্য এ হাদীস শরীফ ব্যতীত আর কিছু পাননি। তারা এটাকে অতি গর্ব সহকারে পেশ করে থাকেন। এখন খন্ডন বা জবাব দেখুন!

খন্ডন

এ হাদীস শরীফে ظل (যিল্ল) মানে ওই প্রসিদ্ধ ছায়া নয়, যা জড় দেহের হয়ে থাকে। কেননা, মদীনা মুনাওয়ারার গ্রীষ্মকালে ঠিক দুপুরে এ ছায়া পড়েই না। আর এত দীর্ঘ ছায়া, যাতে অন্য কোন মানুষ তাতে চলতে পারে! এতো গ্রীষ্মকালে দুপুরের সময় আমাদের দেশেও পড়ে না। সুতরাং এখানে এ ছায়া বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। আরবীতে, বরং উর্দুতেও দয়া, মেহেরবাণী, বদান্যতা এবং আশ্রয়কেও 'ছায়া'

বলা হয়। সাধারণভাবে বুযুর্গদের নামের সাথে লিখা হয়- 'দা-মা যিল্লুহুম' (دَامَ ظِلُّهُمْ) অর্থাৎ তাঁদের ছায়া দীর্ঘস্থায়ী হোক! অথবা বলা হয়- (مُدَّ ظِلُّهُمْ (মুদ্দা যিল্লুহুম) অর্থাৎ তাঁদের ছায়া দীর্ঘ হোক! এর এ অর্থ নয় যে, হযরত সাহেব বা সাহেবগণ দিন ও রাতভর রোদ ও আগুনের মধ্যে উত্তপ্ত হতে থাকুন; এবং তাঁদের ছায়া পড়তে থাকুক; বরং মর্মার্থ এ'যে, তাঁদের দয়া, বদান্যতা ও আশ্রয় দীর্ঘস্থায়ী হোক! হাদীস শরীফে আছে-

اَلسُّلْطَانُ الْعَادِلُ الْمُتَوَاضِعُ ظِلُّ اللهِ

অর্থঃ বিনয়ী ন্যায়বিচারক বাদশাহ্ হলেন আল্লাহর ছায়া।

[সূত্র. জামে'-ই সগীর: ২য় খন্ড: পৃ. ৩১]

আরো বর্ণিত আছে- سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهٖ

অর্থাৎ সতজন লোক এমন রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁর আরশের ছায়ায় রাখবেন।

দেখুন, না আল্লাহ্ তা'আলা জড়দেহ বিশিষ্ট যে, তাঁর ছায়া পড়বে, না আরশে আ'যম ছায়া বিশিষ্ট কোন শরীর। এখানে উভয় স্থানে 'ছায়া' মানে রহমত ও আশ্রয়।

অনুরূপ, হাদীস শরীফে আছে-

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا

অর্থঃ জান্নাতে একটি গাছ এমন রয়েছে, যার ছায়ায় অশ্বারোহী শত বছর যাবৎ দৌড়াতে থাকলেও সেটার ছায়াটুকু অতিক্রম করতে পারবে না।

[সূত্র. সিফাতুল জান্নাহ, অধ্যায়: মুসলিম শরীফ ও বোখারী শরীফ]

দেখুন, জান্নাতে না রোদ আছে, না চাঁদের আলো। এতদ্সত্ত্বেও ত্বুবা (طوبٰى) বৃক্ষের ছায়ার অর্থ কি? ওখানেও 'ছায়া' মানে 'আশ্রয়' অর্থাৎ সেটার নিচে অবস্থান করা। হে আপত্তিকারীরা! আপনাদের উপস্থাপিত হাদীসে যদি 'ছায়া' মানে ওই 'প্রসিদ্ধ ছায়া'ই হয়, তাহলে এ হাদীস আমাদের উপস্থাপিত হযরত যাক্ওয়ান কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-এরও পরিপন্থী (বিপরীত) হবে এবং ক্বোরআন মজীদের ওই আয়াতগুলোরও বিপরীত হবে, যেগুলো প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

আপত্তি-২

ক্বোরআন-ই করীম-এ মহান রব এরশাদ করেন-

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَاخَلَقَ اللهُ مِنْ شَىْءٍ يَتَفَيَّؤُ ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ O

তরজমা: এবং তারা কি দেখেনি যে, যে বস্তু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সেটার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে, আল্লাহকে সাজদা করে এবং তারা তাঁরই সম্মুখে হীন?

[সূরা নাহ্ল: আয়াত-৪৮]

এ আয়াত শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, প্রত্যেক জিনিষ নিজেও আল্লাহকে সাজদাহ্ করে এবং সেটার ছায়াও। যদি হুযূর-ই আক্রামের ছায়া না থাকে, তাহলে হুযূর তো অন্য সৃষ্টির তুলনায় কম ইবাদতকারী হবেন! সমস্ত সৃষ্টির দু'টি করে সাজদা হবে, আর হুযূরের হবে শুধু একটা সাজদা। সুতরাং হুযূর-ই আক্রামের ছায়া ছিলো, হুযূর-ই আক্রামের ইবাদত ও দু'ধরনের হয়।

খন্ডন

এ আপত্তির দু'টি জবাব দেওয়া যায়- একটি তাদের কথার ভিত্তিতে (الزامى), আরেকটি গবেষণালব্ধ (تحقيقى)।

প্রথমোক্ত জবাবটি হচ্ছে- আপনাদের এ প্রশ্ন থেকে একথা অপরিহার্য হয়ে যায় যে, যখন কোন দেওবন্দী মৌলভী সাহেব এমন ছায়ায় নামায পড়েন, যেখানে ওই মৌলভী সাহেবের ছায়া পড়ছিলো না, আর সেখানে কোন জানোয়ার রোদে দন্ডায়মান থাকে, যার ছায়া পড়ছিলো, তখন তো ওই মৌলভী সাহেব থেকে ওই জানোয়ার উত্তম হয়ে যাবে। কারণ, তখন তো মৌলভী সাহেব শুধু নিজের সাজদাহ করছেন, ছায়া করছেনা। আর ওই জানোয়ারও সাজদা করছে, তার ছায়াও। সুতরাং আপনারা নিজেদের সম্পর্কে এর যে জবাব দেবেন, ওই জবাব এখানেও দিয়ে দেবেন বৈ-কি?

আর গবেষণাধর্মী জবাব হচ্ছে- হুযূর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একটা মাত্র সাজদাহ, সমগ্র দুনিয়ার পূর্ণ জীবনের ইবাদতগুলো থেকেও উত্তম। যখন হুযূর-ই আক্রামের সাহাবীর সোয়া সের যব দান করা আমাদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ খয়রাত করা অপেক্ষাও উত্তম হলো, তখন হুযূর-ই আক্রামের ইবাদতগুলোর প্রসঙ্গে বলার কি আছে? কোন জিনিষ ছায়া ধারণ করুক কিংবা না করুক, সেটা হুযূর-ই আক্রামের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না।

মৌলভী সাহেব! ভবিষ্যতে আপনি এবং আপনার দল সব সময় রোদে নামায পড়বেন, যাতে ডবল সাজদাহ্ হয়- আপনাদেরও, আপনাদের ছায়ারও।

আপত্তি- ৩

মহান রব ক্বোরআন মজীদে এরশাদ ফরমান- قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

তরজমা: হে হাবীব! আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতো মানুষ।

[সূরা কাহ্ফ: আয়াত-১১০]

যখন ক্বোরআনের বর্ণনানুসারে হুযূর আমাদের মতো, আর আমরা ছায়াবিহীন নই; বরং ছায়াবিশিষ্ট, সুতরাং এটা উচিৎ হবে যে, হুযূরও ছায়াবিহীন না হওয়া; বরং ছায়াবিশিষ্ট হওয়া, অন্যথায় (مِثْلُكُمْ) (তোমাদের মতো)-এর মর্মার্থ প্রকাশ পাবে না।

খন্ডন

এ আপত্তিরও দু'টি জবাব দেওয়া যায়- একটা তাদের কথার ভিত্তিতে পাল্টা জবাব (الزامى), আরেকটা গবেষণাধর্মী (تحقيقى)।

প্রথমোক্ত জবাবটা হচ্ছে- তাহলে তো এভাবে বলুন, "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের মতো মানুষ, অথচ আমরা তো না নবী, না রসূল, না শফী'উল মুযনিবীন (গুনাহ্গারদের জন্য সুপারিশকারী), না রাহমাতুল্লিল 'আলামীন (সমস্ত জগতের জন্য রহমত), সুতরাং না'ঊযুবিল্লাহ্ (আল্লাহর পানাহ্) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও না নবী, না রসূল, না অন্য কোন উচ্চ পর্যায়ের গুণে গুণান্বিত। (بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) (তোমাদের মতো মানুষ)-এর এ তাফসীর বা ব্যাখ্যা করলে নবূয়ত ও রিসালত ইত্যাদিকেই অস্বীকার করা হবে।

গবেষণালব্ধ জবাব হচ্ছে এ যে, এ আয়াত শরীফে সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য (مثليت) শুধু এতেই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য বান্দারমতো না খোদা, না খোদার বংশধর, না খোদার আত্মীয় ভাই ইত্যাদি; বরং তিনি হলেন খাঁটি বান্দা, তাঁর মধ্যে 'উলূহিয়্যাৎ' (খোদাত্ব)-এর লেশ মাত্রও নেই। (তাছাড়া, তিনি শুধু বাহ্যিকভাবে বশর, বাস্তবিকপক্ষে নূরী বশর। ইত্যাদি)

বস্তুত: বিরুদ্ধবাদীদের নিকট হুযূর-ই আক্রামের ছায়া থাকার পক্ষে কোন শক্তিশালী তথা গ্রহণযোগ্য দলীল-প্রমাণ নেই। তারা নিছক বিদ্বেষ ও জেদ বশত অস্বীকার করেন। অনুরূপ, তারা অনর্থক সংশয়-সন্দেহটিকে দলীল মনে করে বসেছেন। আমরা তো ওই পরিমাণ ক্বোরআনী আয়াত, নবী করীমের হাদীস, বুযুর্গানে দ্বীনের অভিমত, যুক্তি বা বিবেকগ্রাহ্য প্রমাণাদি এবং আপনাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অভিমতও পেশ করেছি। সুতরাং আপনারাও হুযূর-ই আক্রামের ছায়া ছিলো মর্মে আয়াত কিংবা হাদীস অথবা সাহাবীর বাণীও পেশ করুন! যদি উপস্থাপন করতে অপরাগ হন, তাহলে আক্বা-ই দো-জাহান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একটি খোদাপ্রত্ত মু'জিযা ও গুণকে কেন অস্বীকার করছেন?

আফসোস্! অন্যান্য জাতির লোকেরা তাদের বড়দের মিথ্যা বুযুর্গী ও বানোয়াট গুণাবলী বলে বেড়ায়, আর আপনারা নিজেদের রসূলের সত্য গুণাবলী মানতেও প্রস্তত নন। যদি এ ধরনের লাখো কামালাত মহান রব হুযূরকে দিয়ে দেন, তবে

আপনাদের ক্ষতি কি? আল্লাহ্ তা'আলা ওই চক্ষু দান করুন, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কামালাত (গুণাবলী) দেখতে পায়। আ-মী-ন।

آنکھ والا تیرے جلوں کا تماشا دیکھے دیدہ کور کیا آئے نظر کیا دیکھے

অর্থ: চক্ষু বিশিষ্ট লোকই তো আপনার আলোরাশির ছড়াছড়ি দেখতে পায়। অন্ধ চোখে কি-ই বা দেখা যাবে, সে কি-ই বা দেখতে পাবে?

বন্ধুরা!

এ যাহেরী চোখগুলো যাহেরী সুরমা দ্বারা সতেজ হয়, কিন্তু হৃদয়ের চক্ষু আউলিয়া কেরামের দরজার মাটি ও ধূলিবালি দ্বারা আলোকিত হয়। কোন বুযুর্গ ব্যক্তির আস্তানার মাটি হৃদয়ের চোখের উপর মালিশ করুন, যাতে অন্তর্দৃষ্টি সতেজ হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আবূ জাহল শুধু যাহেরী চোখে দেখেছে। তাই কাফিরই রয়ে গেছে। হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অর্ন্তচক্ষু দ্বারাও দেখেছেন। তাই তিনি পাকাপোক্ত মু'মিনও হয়েছেন, সাহাবীও হয়েছেন।

سرمہ کن در چشم خاک اولیاء - تا بہ بینی را بتداء تا انتہاء

অর্থ: ওলীগণের দরবারের মাটিকে চোখের সুরমা হিসেবে লাগাও! তখন (সৃষ্টির) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবে।

---o---

ইমাম গায্যালী
রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির
অভিমত

তিনি বলেন, নবী করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া এজন্য ছিলো না যে, ছায়া দেহ অপেক্ষা বেশী সুক্ষ্ম হয়; যেমনিভাবে দেওয়াল ও গাছ ইত্যাদি জড় দেহ এবং সেগুলোর ছায়া সুক্ষ্ম হয়। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর মুবারক থেকে বেশী সুক্ষ্ম কারো দেহ হতে পারে না। যদি তাঁর ছায়া থাকতো, তবে তা তাঁর চেয়েও বেশি সুক্ষ্ম হতো এবং তাঁর নিজস্ব 'সুক্ষ্ম' গুণটি হ্রাস পেতো; অথচ তিনি তাঁর সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য সর্বাপেক্ষা পূর্ণ। এ মুখোমুখি হওয়া মহান রবের নিকট পছন্দনীয় ছিলোনা।

سایہ پسند آیا نہ پروردگار کو ! - بے سایہ کر دیا اس سایہ دیوار کو

অর্থ: মহান প্রতিপালকের নিকট যেহেতু ছায়া থাকা পছন্দনীয় ছিলোনা, সেহেতু তিনি ওই দেওয়ালের ছায়াকেও ছায়াহীন করে দিয়েছেন।

পরিশেষে, আক্বা-ই দো'আলম হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছায়াহীন হওয়ার পক্ষে এতগুলো দলীল ও অভিমত রয়েছে যে, যদি এটাকে ইজমা' সম্মত দলীল সাব্যস্ত করা হয়, তবে অত্যুক্তি হবে না। জানিনা, অস্বীকারকারীদের এটা মেনে নিতে অপরাগতা কোথায়? এটা তো কোন আশ্চর্যের কথা হতে পারে না, না ছায়াহীন হওয়া 'আল্লাহ্ হওয়া'র চিহ্ন, যাতে এ আক্বীদা শির্ক হতো। দুনিয়ায় কোটি কোটি জিনিষ ছায়াহীন রয়েছে। ওখানে ওইগুলোকে (ছায়াহীন) মানতে কোন বাধা নেই। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ وَزِيْنَةِ فَرْشِهٖ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ

সমাপ্ত